মরণজয়ী বীর

(বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের ভূমিকা সম্বলিত)

শ্রীসুধীরকুমার সেন

ঘোষ এণ্ড সন্স
৩৬নং ব্রজনাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

মূল্য—এক টাকা আট আনা

ঘোষ এণ্ড সন্সের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দ কুমার ঘোষ, ৩৬নং ব্রজনাথ দত্ত লেন, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত ও নিউ মহামায়া প্রেসের শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কখনও রক্তরঞ্জিত সশস্ত্র বিপ্লবের পথে, কখনও বা আত্মিক বলদৃপ্ত নিরুপদ্রব প্রতিরোধের পথে চলিয়াছে। কিন্তু সংগ্রামের সর্ব্বস্তরেই আমরা এমন কতকগুলি মুক্তিপাগল মানবের সাক্ষাত পাই যাহারা যে কোনও জাতির জীবনে গর্ব্বের বস্তু। শহীদ জীবনী জাতীয় সম্পদ। দেশের মুক্তি সংগ্রামে যাঁহারা নিঃশব্দে জীবন দিয়াছেন, বৈদেশিক শাসনের শত-বাধা নিষেধের চাপে আমরাও এযাবত তাঁহাদের ত্যাগের মর্য্যাদা দিতে পারি নাই। আজিকার লব্ধ স্বাধীনতা আমাদের সেই সুযোগ দিয়াছে, এযাবত যাঁহাদের স্মৃতি আমাদের মনের সঙ্গোপনে সঞ্জীবিত ছিল তাঁহাদিগকে আজ জাতীয় বীরের পরিপূর্ণ মর্য্যাদায় ভূষিত করার সময় আসিয়াছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আগামীকালে রচিত হইবে, তাহাতে জাতীয় বীরগণের অবদান যাহাতে পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করে, তাহার জন্য আজ সকলকেই সজাগ থাকিতে হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এইরকম কয়েকজন শহীদের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। এই ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে। ইতি—

কলিকাতা,
১৬ই অক্টোবর, '৪৭

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

আমার কথা

ভারতের যে মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষাত্রধর্ম্মী সন্তানেরা ইংরাজের শাসন ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ইস্পাত ও বিস্ফোরকের সাহায্যে স্বাধীনতার পতাকা ওড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, তাদেরই কয়েকজনের জীবন-কথা এই বইতে সঙ্কলিত হল। ইংরাজের জবরদস্তী এযাবত আমাদের সত্য কথা বল্‌তে, সত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে অবকাশ দেয়নি, যে-কাহিনী আমাদের কাছে সব চেয়ে বেশী পূত ও পবিত্র, যা আমাদের চোখে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, তাকে শুধু তারা নিজেরাই বিকৃত করেনি, আমাদেরও বাধ্য করেছে বিকৃত করতে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে আজ এই বিকৃতির পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে হবে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর জাতির ওপর যে নূতন দায়িত্ব বর্ত্তেছে, তার মধ্যে এর স্থান সকলের ওপরে। ঐতিহ্যই জাতিকে মহত্তর প্রেরণা যোগায়, যে জাতির পিছনে ঐতিহ্য নেই, সে ভবিষ্যতের মধ্যেও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগুবার সাহস বা মনোবল পায় না। নূতন ভারত গড়বার কাজে যাঁরা হাত দেবেন, ভারতের পুরাতন ঐতিহ্যকে স্বীয় মর্য্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ তাঁদের সর্ব্বাগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করতে হবে।

বাঙ্গলার অগ্নিযুগের অন্যতম নায়ক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ বাহুল্য মাত্র।

কলিকাতা,
১৭ই অক্টোবর, '৪৭

সুধীরকুমার সেন

বিষয়-সূচী

"उनको यादमें जिन्होंने अपने खूनसे
हिंदुस्तानके बागको सींचा"

मौलाना आजाद

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় যে নূতন বাঙ্গলার জন্ম হয়েছিল, তা বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের, ব্রহ্মবান্ধব ও অরবিন্দের বাঙ্গলা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মহারাষ্ট্র যে জঙ্গী জাতীয়তাবোধে দীক্ষা নিয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তা-ই বিবেকানন্দের পৌরুষের আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের জাগরণী মন্ত্র ও অরবিন্দের আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণীকে বাহন করে নূতন এক ভাববন্যায় সমগ্র বাঙ্গলাকে প্লাবিত করল। কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতৃত্ব তখনও চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারত-

বাসীদের একটু বেশী কর্ত্তৃত্ব ও আইনসভায় গোটাকয়েক বেশী আসন নিয়ে ইংরাজের সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে দর কষাকষি করছে, আবেদন-নিবেদনের থালি সাজিয়ে বৎসরান্তে ইংরাজের দরবারে হাজির হওয়াই তার কাজ। কিন্তু বাঙ্গলার জাগ্রত যৌবন মধ্যপন্থীদের এই সতর্ক পদক্ষেপ মেনে নিতে রাজী হল না।

ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে লর্ড কার্জন তখন এখানে বসে ভারতীয়দের জাতীয় মর্য্যাদাবোধের ওপর একের পর এক আঘাত হেনে চলেছেন। এরই চরম পরিণতি হল বঙ্গভঙ্গ। বাঙ্গলার সমগ্র আত্মা কার্জনের এই শেষ আঘাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বয়কট, হরতাল, স্বদেশী আন্দোলন—বাঙ্গলার যৌবন-শক্তি ইংরাজের স্বৈর-নীতির বিরুদ্ধে উদ্যত খড়্গের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াল। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর সরকারীভাবে বঙ্গবিচ্ছেদ ঘোষণা করা হল। কিন্তু বাঙ্গলা সেই বিচ্ছেদ মেনে নিল না, বাঙ্গালী সেদিন বাঙ্গলার অখণ্ডতার দ্যোতক হিসেবে পরস্পরের হাতে নব-মিলনের রাখী বেঁধে দিল।

জঙ্গী মনোভাব-দৃপ্ত স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার তখন বিচ্ছিন্ন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের নূতন লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর। ব্যামফিল্ড হুমকী দিলেন, 'Bloodshed may be necessary'। তার পরেই পূর্ব্ববঙ্গে গুর্খা সৈন্যদের উপস্থিতির কথা ঘোষিত হল। কিন্তু বাঙ্গলা ভয় পেল না, ফুলারের সেই চ্যালেঞ্জ তারা গ্রহণ করল। বরিশালের রাস্তা চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য

দেশসেবকদের রক্তে রঞ্জিত হল। উদ্ধত ইংরাজ অপমানের পর অপমান, আঘাতের পর আঘাত হেনে বাঙ্গলার কণ্ঠরোধ করতে চাইল, নির্লজ্জ নির্য্যাতন দ্বারা বাঙ্গলার নব-জাগ্রত জাতীয়তাবোধকে পিষে মারবার প্রয়াস পেল। ইংরাজের এই নীতিবর্জ্জিত শাসন-রীতিই বাঙ্গলায় বিপ্লবধর্ম্মী সন্ত্রাস-বাদীদের আবির্ভাবের পরিবেশ যোগাল, অগ্নি ও ইস্পাতের মন্ত্রে বাঙ্গলাকে দীক্ষা দিল।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল রাত্রি সাড়ে-আটটায় মোজাফ্‌ফরপুরে বোমা পড়ল—বাঙ্গলায় প্রথম বোমা।

বোমাটা ফাটল একটা ফিটন গাড়ীর মধ্যে। গাড়ীখানা চুরমার হয়ে গেল, সইস, কোচম্যান দু'জনেই জখম হল। গাড়ীর মধ্যে ছিলেন মোজাফ্‌ফরপুরের শ্বেতাঙ্গ উকীল মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা। কন্যা আহত হয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন, মিসেস কেনেডিও দু'দিন হাসপাতালে থেকে ইহধাম হতে বিদায় নিলেন।

পরদিন সকাল আটটার সময়ে মোজাফ্‌ফরপুর থেকে পনের মাইল দূরে ওয়ানি ষ্টেশনে এক মুদীর দোকানে একটি উনিশ বছরের ছেলে ধরা পড়ল—নাম তার ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করেছিল ফতে সিং ও শিউপ্রসাদ সিং নামে দু'জন কনষ্টেবল। শ্রান্তদেহ ক্ষুদিরাম বাধা দিল, কিন্তু চেষ্টা সফল হল না। কনষ্টেবলদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে তার কোমর থেকে একটা ভারী রিভলভার মাটিতে পড়ে

গেল। এর পর সে একটা ছোট রিভলভার বের করে ব্যবহারের চেষ্টা করল, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। শেষ পর্য্যন্ত পুলিস তাকে কাবু করে ফেলল। ক্ষুদিরামের দেহ তল্লাসী করে ত্রিশটা কার্ত্তুজও পাওয়া গেল।

ঐদিন মোকামাঘাট ষ্টেশনেও এক কাণ্ড ঘটে গেল। মোজাফ্‌ফরপুরে যখন বোমা ফাটে, তখন ক্ষুদিরামের সঙ্গে ছিল দীনেশ নামে আর একটি ছেলে। বোমা ফাটবার অব্যবহিত পরেই ক্ষুদিরাম ও দীনেশ আলাদা পথে পদব্রজে মোকামাঘাট ষ্টেশনের দিকে রওনা হল। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল মোজাফ্‌ফর-পুরের তিন ষ্টেশন আগে, ওয়ানিতে। এক মুদীর দোকানে দাঁড়িয়ে মুদীর সঙ্গে আলাপ করবার সময়ে পুলিস সন্দেহ-ক্রমে তাকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে, দীনেশ সমষ্টিপুরে পৌঁছুলে সেখানে ঘটনাচক্রে তার সাক্ষাৎ হল নন্দলাল ব্যানার্জি নামে একজন দারোগার সঙ্গে। নন্দলাল সাদা পোষাকে ছিল বলে দীনেশ তার প্রকৃত পরিচয় পেল না। কথাবার্ত্তায় সে সমস্ত ঘটনা নন্দলালের কাছে প্রকাশ করে ফেলল। নন্দলাল নিজের আসল পরিচয় গোপন রেখে দীনেশকে মোকামাঘাট ষ্টেশনে নিয়ে এল এবং এখানে একজন কনষ্টেবলকে দীনেশের ওপর লক্ষ্য রাখার ভার দিয়ে মোজাফ্‌ফরপুরের পুলিস সুপারিনটেণ্ডেট আমষ্ট্রংকে সমস্ত ঘটনা জানাল। আমষ্ট্রং-এর কাছ থেকে অনুমতি লাভের পর ২রা মে অপরাহ্নে নন্দলাল দীনেশকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু নন্দলালের বাসনা পূর্ণ হল না,

গ্রেপ্তারের পূর্ব্বেই দীনেশ নিজের মস্তক ও কণ্ঠনালীতে গুলী করে আত্মহত্যা করল। এই দীনেশরই প্রকৃত নাম প্রফুল্ল চাকী।

কেনেডি-পত্নী ও দুহিতার হত্যাকারীকে আবিষ্কারের জন্য নন্দলাল গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এক হাজার টাকা পুরস্কার পেল বটে, কিন্তু টাকা ভোগ করা তার অদৃষ্টে আর হয়ে উঠল না। কিছুদিনের মধ্যেই সে কলিকাতায় বিপ্লবীদের হাতে নিহত হল।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রেট্হাউড ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জবানবন্দীতে ক্ষুদিরাম সব কিছুই স্বীকার করল। সে বলল যে, মোজাফ্ফরপুরের নব-নিযুক্ত জিলা ও দায়রা জজ কিংসফোর্ডকে হত্যা করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য।

এখানে কিংসফোর্ডের কাহিনী কিছু বলা দরকার। মোজাফ্ফরপুরে আসার আগে ইনি ছিলেন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। কলিকাতায় 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'বন্দে মাতরম' প্রভৃতি পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে মামলা সম্পর্কে কিংসফোর্ড জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মহলে অত্যন্ত অখ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। 'বন্দে মাতরমে'র বিরুদ্ধে মামলার কালে বিপিনচন্দ্র পালকে সরকারপক্ষের সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হয়। কিন্তু বিপিনচন্দ্র তাতে অস্বীকৃত হলে আদালত অবমাননার অভিযোগে ছ'মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিপিন-চন্দ্রের কারাদণ্ডের আদেশ হলে তাঁকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আদালত-ভবনের দ্বারদেশে যে জনতার সমাবেশ

হয়, তার মধ্যে সুশীল নামে একটি কিশোরও ছিল। একজন সার্জেণ্ট সুশীলকে ঘুষি মারলে সে তাকে পাল্টা ঘুষি মারে। এই ঘটনার জন্য আদালতে সুশীলকে অভিযুক্ত করে কিংসফোর্ড তাকে পনের ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন।

কিংসফোর্ডের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী ও বিপ্লবীদলের যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, সুশীলের বেত্রদণ্ড তাতে যেন ঘৃতাহুতি দিল। সুশীল বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। এর পরই বিপ্লবীদের গুপ্তচক্রের বৈঠকে রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ ও চারু দত্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিংসফোর্ডকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কলিকাতায় থাকা কালেই কিংসফোর্ড জনতা কর্তৃক দু'বার আক্রান্ত হন। মোজাফ্‌ফরপুরে আসার পর তাঁর নামে একটা পার্সেল আসে। এই পার্সেলের মধ্যে একখানা বই ছিল এবং বইয়ের ভেতরে কিয়দংশ কেটে একটা বোমা সুকৌশলে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কিংসফোর্ড পার্সেলটা না খুলে রেখে দেওয়ায় এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

মোজাফ্‌ফরপুরে আসার পর কিংসফোর্ডকে তাঁর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং কলিকাতার তদানীন্তন পুলিস কমিশনার হ্যালিডের কাছ থেকে একখানা পত্র পেয়ে মোজাফ্‌ফরপুরের পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তহশীলদার খাঁ ও ফয়েজুদ্দীন নামক দু'জন কনষ্টেবলকে কিংসফোর্ডের বাংলো পাহারায় নিযুক্ত করেন।

এদিকে বিপ্লবীদলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিংসফোর্ডকে হত্যার

জন্য প্রস্তুতি চলল। বারীন্দ্রকুমারের মুরারিপুকুরের বাগান বাড়ী থেকে প্রফুল্ল চাকী এবং মেদিনীপুরের বিপ্লবী কর্ম্মী সত্যেন বসুর সুপারিশে ক্ষুদিরাম বসু এই কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট হল। ২৫শে এপ্রিল শনিবার হাওড়া ষ্টেশন থেকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল মোজাফ্‌ফরপুরে যাত্রা করল। ২৭শে এপ্রিল তারা মোজাফ্‌ফবপুরে পৌছে কিশোরীমোহন ব্যানার্জির ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করল। ৩০শে এপ্রিল বোমা ফাটল।

১৯০৮ সালের ৮ই জুন মোজাফ্‌ফরপুরে অতিরিক্ত দায়রা জজ কারেড্রেফ আই-সি-এস'এর এজলাসে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ থেকে আনীত যে মামলার শুনানী আরম্ভ হয়, তাতে কিশোরীমোহন ব্যানার্জিকেও হত্যা সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ প্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু পরে গবর্ণমেণ্ট কিশোরীমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়।

ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মামলায় সরকারপক্ষে মামলা পরিচালন করেন মান্নুক ও পাটনার সরকারী উকীল বিনোদবিহারী মজুমদার। স্থানীয় উকীল কালিদাস বসু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ান। পরে রংপুরের কুলকোমল সেন ও নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক আর একজন উকীলও ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করেন। বাবু নাথুনিপ্রসাদ ও বাবু জনকপ্রসাদ নামে ছ'জন এসেসরের সাহায্যে মামলার বিচার করা হয়। এই মামলায় সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

মামলার শুনানী আরম্ভ হলে বিচারক ক্ষুদিরামকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পড়ে শোনান। ক্ষুদিরাম অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করল। ১০ই জুন কিংসফোর্ডের গাড়োয়ান কালীরাম এবং তহশীলদার খাঁ, ফয়েজুদ্দীন ও ইয়াকুব আলি—এই তিনজন কনষ্টেবলের সাক্ষ্য নেওয়া হল। ১১ই জুন সাক্ষ্য দিল ফতে সিং ও শিউপ্রসাদ মিশির।

ক্ষুদিরামের পক্ষের উকীলেরা ক্ষুদিরামকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য বিচারকের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বিচারক অনুমতি দিলে, তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম বলে যে, তার পিতামাতা জীবিত নেই। সৎমা আছেন, তিনি তাঁর ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের নিকট থাকেন। অমৃতলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হয়। অমৃতলাল মেদিনীপুরে জজ কোর্টের ক্লার্ক ছিলেন। তার (ক্ষুদিরামের) পড়াশুনা তখনকার দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত, দু'তিন বছর সে পড়া ছেড়েছে।

প্রশ্ন—তুমি কি কাকেও দেখতে চাও ?

উঃ—আমি একবার মেদিনীপুরে যেতে এবং আমার দিদি ও তাঁর ছেলেমেয়েদের দেখতে চাই।

প্রশ্ন—তুমি তোমার কোনও আত্মীয়ের নিকট খবর পাঠাতে চাও ?

উঃ—না।

প্রশ্ন—জেলে তোমার ওপর কিরকম ব্যবহার করা হচ্ছে ?

উঃ—মন্দ নয়। জেলের খাবার খারাপ বলে আমার

স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে, তবে আমার প্রতি অন্য কোনও খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। আমাকে দিনরাত নির্জ্জন সেলে আটক রাখা হয়। একা থাকা অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে। সংবাদপত্র বা বই পড়বার খুব ইচ্ছা হয়, কিন্তু কিছুই আমাকে দেওয়া হয় না।

প্রশ্ন—তোমার মনে কি কোনও ভয় হয়েছে ?

উঃ—না, ভয় পাব কেন (হাস্য) ?

প্রশ্ন—তুমি কি গীতা পড়েছ ?

উঃ—হ্যাঁ, আমি গীতা পড়েছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রেট্‌হাউডের নিকট ক্ষুদিরাম যে বিবৃতি দিয়েছিল, তা ১২ই জুন তাকে পড়ে শোনান হল। ১৩ই জুন সরকারপক্ষের সওয়াল শেষ হলে কালিদাস বাবু ক্ষুদিরামের পক্ষে সওয়াল করতে উঠলেন। কালিদাস বাবু ক্ষুদিরামের তরুণ বয়সের প্রতি জজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে, অপরের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েই সে এই কাজ করেছে। সওয়াল শেষ হলে জজ এসেসরদের মামলা বুঝিয়ে দিলেন। এসেসরেরা ক্ষুদিরামকে দোষী বলে ঘোষণা করলেন। জজ তাদের সঙ্গে একমত হয়ে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

রায় দিয়ে জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা সে বুঝতে পেরেছে কি ? উত্তরে ক্ষুদিরাম বলে যে, হ্যাঁ, সে বুঝতে পেরেছে। সম্পূর্ণ অবিচলিতচিত্তে সে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে।

কোর্টে মামলা চলার কালে ক্ষুদিরাম একান্ত শান্ত ও নিরাসক্তভাবে আদালত-কক্ষে বসে থাকত। কখনো-কখনো দেখা যেত যে, কাঠগড়ার মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার কখনও বা সে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে মামলা শুনত।

হাইকোর্টে আপীল করার জন্য ক্ষুদিরামকে সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই ক্ষুদিরামের পক্ষ থেকে আপীল করা হল, বিখ্যাত আইনজীবী নরেন্দ্রনাথ বসু তার পক্ষে মামলা পরিচালন করলেন। ১৩ই জুলাই বিচারপতি ব্রেট্ ও বিচারপতি রাইভ্স আপীল অগ্রাহ্য করে মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখলেন। ১১ই আগস্ট ভোর ছ'টায় মোজাফ্ফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল।

ক্ষুদিরামের ইচ্ছানুযায়ী উকীল কালিদাস বাবু তার মৃতদেহ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শবদাহের অনুমতি দিলে বিনা আড়ম্বরে গণ্ডক নদীর তীরে ক্ষুদিরামের নশ্বর দেহ দাহ করা হল। মৃতদেহের সঙ্গে অল্প কয়েকজন লোক শ্মশানঘাটে গিয়েছিল। রাস্তার দুই পাশে সহস্র সহস্র লোক সেদিন ক্ষুদিরামের শেষ যাত্রা প্রত্যক্ষ করেছিল।

অগ্নিমন্ত্রে বাঙ্গলার দীক্ষার সেই প্রথম যুগে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামই সকলের আগে শহীদী-মৃত্যু বরণ করে মুক্তিপাগল জাতিকে পথ দেখিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় জাতীয়তা-বোধের যে বন্যা এসে বাঙ্গলাকে প্লাবিত করেছিল, সে

যুগের অন্যান্য বহু দুঃখব্রতী তরুণের মত এরাও তারই মধ্যে নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিল, দুর্গম পথযাত্রার বিঘ্ন-বিপদ তাদের বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারে নি।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে—কর্ম্মজীবনের যখন সবে সূচনা, তখন ক্ষুদিরাম পৃথিবী হতে বিদায় নিল। ক্ষুদিরামের পিতা ত্রৈলোক্যনাথ ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া পুত্রের অত্যন্ত শৈশবেই পরলোকগমন করেন। তার পর তমলুকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অপরূপা ও তাঁর স্বামী অমৃতলাল রায়ের আশ্রয়ে তার জীবনের সূচনা হয়। ১৯০৪ সালে অমৃতবাবু মেদিনীপুরে বদলী হলে ক্ষুদিরামও সেখানে আসে। এইখানেই সে রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসে এবং বৈপ্লবিক চিন্তারীতি ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষা পায়। ১৯০৫ সালে সে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে।

১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর সহরে পুরানো জেলখানার মধ্যে একটা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়। অষ্টাহব্যাপী মেলার শেষে যে পুরস্কারবিতরণী সভার অনুষ্ঠান হয় তাতে জিলার বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এই দিন ক্ষুদিরাম মেলায় প্রবেশদ্বারের নিকটে দাঁড়িয়ে একখানা রাজদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিলোতে সুরু করে। মেলার স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়কের নির্দ্দেশে একজন সিপাই ক্ষুদিরামকে ধরতে গেলে সে সিপাইর নাকে ঘুসি মেরে রক্তপাত ঘটিয়ে সরে পড়ে। এর পর প্রায় একমাস পরে আলিগঞ্জের এক তাঁতশালাতে ক্ষুদিরাম পুলিসের

হাতে ধরা পড়ল। কিন্তু বিচারক তাকে নিতান্ত অল্পবয়স দেখে মুক্তি দেন। মুক্তির পরে ছাত্ররা বিরাট এক শোভা-যাত্রা করে তাকে নিয়ে সহর পরিভ্রমণ করে। 'মেদিনী-বান্ধব' সম্পাদক দেবদাস করণ এই সময়ে তাঁর সাপ্তাহিকীতে ক্ষুদিরামের দেশপ্রেমের প্রশংসা করে এক প্রবন্ধ লেখেন।

এর পর দিদি অপরূপা কিছুকাল হাটগাছায় গিয়ে বাস করতে থাকেন। এই সময়ে ক্ষুদিরাম রীতিমতভাবে গুপ্ত সমিতিতে ভিড়েছে।

১৯০৭ সালে ক্ষুদিরাম হাটগাছায় গেল। একদিন রাত প্রায় সাড়ে-আটটার সময়ে ভয়ানক রকমের চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের লোকেরা বাড়ীর বার হয়ে দেখে যে, একজন ডাকহরকরা প্রহৃত হয়ে চেঁচাচ্ছে, কে যেন তার ডাক লুটে নিয়েছে। অপরূপা ঘরে এসে দেখলেন যে ক্ষুদিরাম ঘরের মধ্যে হাঁপাচ্ছে। সেই রাত্রেই ক্ষুদিরাম অদৃশ্য হল এবং বিপদসঙ্কুল পথে মেদিনীপুর যাত্রা করল। তখন তার আরও বৃহত্তর কর্ম্মের জন্য ডাক পড়েছে।

কিংসফোর্ড-হত্যার দুঃসাহসিক ব্রতে আর যে তরুণ এসে ক্ষুদিরামের সঙ্গে সেদিন হাত মিলিয়েছিল, তার জন্মভূমি ছিল উত্তর-বঙ্গে। রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে প্রফুল্ল চাকী স্বাজাত্যবোধের পরিবেশের মধ্যেই বেড়ে উঠেছিল। এইখানেই সে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসে এবং রংপুরে বিপ্লবীদলের শারীরচর্চ্চার আখড়ায় বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষালাভ করে। এর পর কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দ্দেশক্রমে সে কলিকাতায় আসে।

কলিকাতায় মাতুলের আশ্রয়ে অবস্থানকালে সে আত্মোন্নতি সমিতিরও সংস্পর্শে আসে। প্রফুল্লর শরীরের গঠন নাকি পাথরের মত কঠিন ছিল, যদিও তার আচরণ ছিল অত্যন্ত অমায়িক। কুচকাওয়াজ করানোয় প্রফুল্ল চাকী অত্যন্ত দক্ষ ছিল।

প্রফুল্ল চাকীর বাড়ী সম্ভবতঃ বগুড়ায়, কারণ, বারীন্দ্রকুমার বোমার মামলায় জবানবন্দীর কালে প্রফুল্ল চাকীকে বগুড়ার লোক বলে উল্লেখ করেছিলেন। রংপুরে থাকার কালেই প্রফুল্লর বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং বৈপ্লবিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে সে সংযুক্ত হয়ে পড়ে।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের জীবন মুক্তিকামী ভারতের স্বাধীনতার তুর্গম পথে যাত্রার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ভারতের জ্ঞানবৃদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা যখন নিবেদনের থালি হাতে বৃটিশের দ্বারে আপোষের জন্য ধরনা দিচ্ছিলেন, তখন এই তু'জন তুঃখব্রতী তরুণ নিদ্রালগ্ন ভারতের কাণে সুপ্তশক্তির উদ্বোধনের মন্ত্র শুনিয়েছিল। আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী গত হল, কিন্তু বাঙ্গলা এখনও তাদের ভোলে নি। আজও কলিকাতার অলি-গলিতে ভিক্ষুকের মুখে, মেদিনীপুরের পথে-প্রান্তরে চাষী-রাখালের কণ্ঠে, পল্লীবাসিনীর অবসর-গুঞ্জনে লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ক্ষুদিরামের স্মৃতি দেশবাসীর চিত্তলোকে অক্ষয় হয়ে রয়েছে :

(আমায়) এবার বিদায় দে মা
ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে জগৎবাসী ॥
ওমা, মাটির বোমা তৈরী করে,
বসেছিলাম লাইনের ধারে, মাগো।
লাট ম'লো না, বিফল হ'লো
মরলো ভারতবাসী ॥
ওমা, শনিবার দিন বেলা ছ'টোতে
লোক ধরে না কোর্টেতে,
অভিরামের দ্বীপ চালান মা,
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥
ওমা, দশমাস দশ দিন পরে,
জন্ম নিব তোর উদরে মাগো,
চিনতে যদি না পারিস মা,
দেখবি গলায় ফাঁসি ॥

ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার পরদিন, ১৯০৮ সালের ২রা মে তারিখে কলিকাতায় মুরারিপুকুরের বোমার বাগান ধরা পড়ল। পুলিস রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, বাগানে হানা দেবার দশ দিন পূর্ব্বে তারা এর অস্তিত্বের খবর পেয়েছিল। এ থেকে অনেকে মনে করেন যে, দলের কোনও সদস্য, ইচ্ছা করেই হোক, আর, অসাবধানতাবশতঃই হোক, পুলিসকে খবর যুগিয়েছিল।

অরবিন্দের সাধনা ও বারীন্দ্রকুমারের সংগঠন সেদিন লোকচক্ষের অন্তরালে বাঙ্গলায় যে অগ্নিসাধকের দল গড়ে তুলেছিল, মুরারিপুকুরের বাগান আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে তারা প্রায় সকলেই কর্ম্মক্ষেত্র হতে অপসৃত হল। মোজাফ্‌ফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের ফলে কেনেডি-পত্নী ও দুহিতার নিহত হওয়ার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছুল ১লা মে তারিখে। তখন অরবিন্দ শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ

ঘোষের সহায়তায় 'বন্দে মাতরম' নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রের সম্পাদনা করছেন। 'বন্দে মাতরম' অফিসে মোজাফ্‌ফরপুরের টেলিগ্রাম পৌঁছনোর পর খবর দেখে শ্যামসুন্দর খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি বারবারই আক্ষেপের স্বরে বলতে লাগলেন, 'ইস্, দু'টো স্ত্রীলোক মরল!' অরবিন্দ এলেন রাত্রে। টেলিগ্রামখানা তাঁর হাতে দেওয়া হলে তিনি কয়েকবার তার ওপর চোখ বুলালেন। তারপর অর্দ্ধস্ফুটস্বরে এক জায়গায় পড়লেন, 'রাত্রি অন্ধকার ছিল।' কিছুক্ষণ পরে আপন মনেই তিনি বলে উঠলেন, 'সেই জন্যই ব্যর্থ হয়েছে।' সেদিন রাত্রে এই পর্য্যন্তই।

কিন্তু পুলিস আর সকাল হতে দিল না। সেদিন ভোর রাত্রেই তারা মুরারিপুকুরের বাগানে হানা দিল, বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর প্রভৃতি বোমা ও বহু অস্ত্রশস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হলেন। অরবিন্দকে ধরা হল তাঁর গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ী হতে। আরও কয়েক জায়গায় তল্লাস হল, কলিকাতার বাইরে থেকেও কয়েকজনকে ধরে আনা হল। শেষ পর্য্যন্ত মোট চৌত্রিশ জনকে আসামী করে পুলিস আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা ফেঁদে বসল।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বাঙ্গলায় যে শহীদী ব্রতের সূচনা করে গিয়েছিল, তারই চূড়ান্ত পরিণতি দেখতে পাই আলিপুরে কারাকক্ষের অন্ধকারে নরেন গোঁসাই হত্যায়। মোজাফ্‌ফরপুরে ক্ষুদিরাম যে বীজ বপন করেছিল, আলিপুরে তা-ই রূপ নিয়েছিল এক বিরাট মহীরূহে, যখন

ব্রত সাধনের নিষ্ঠা বিপ্লবীর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় হয়ে উঠেছে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে তারতম্য বিচারের অবকাশ তার নেই। নরেন গোঁসাই হত্যার এই-ই আদর্শগত পটভূমিকা।

একটা কথা আছে, 'ছায়া পূর্ব্বগামিনী'। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা যখন জেলে, তখন জেলার বেচারী একদিন বন্দীদের সামনে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখুন, আমার হয়েছে তালগাছের আড়াই হাত। তালগাছ সবটা চড়া যায়, কিন্তু শেষ আড়াই হাত ওঠবার সময়ে প্রাণটা বেরিয়ে যায়। এতদিন চাকরী করে এলুম, বেশ নির্ব্বিবাদে কেটে গেল। আর এই পেনসন নেবার সময় আপনাদের হাতে গিয়ে পড়েছি। এখন মানে মানে আপনাদের বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।' কিন্তু মানে মানে বিদেয় করা আর হয়ে ওঠে নি, তালগাছের বাকী আড়াই হাতই শেষ পর্য্যন্ত কাল হয়ে উঠেছিল।

মুরারিপুকুরের বাগান ধরা পড়বার পর পুলিস বিপ্লবীদের ধরবার জন্য যে বেড়াজাল পেতেছিল, তাতে আটকে শ্রীরামপুরের গোস্বামী বাড়ীর নরেন্দ্র গোস্বামীও জেলে এসে হাজির হয়েছিল। মুরারিপুকুরের বাগান পুলিস কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বেই বিপ্লবীদলের কারও কারও মনে এইরূপ সন্দেহ ছিল যে নরেন্দ্র গুপ্তচর, যদিও সে সন্দেহ নাকি সত্য নয়। নরেন্দ্র ধরা পড়বার পর আত্মীয়স্বজনদের তাগিদেই, রাজসাক্ষী হয়েছিল, গুপ্তচরবৃত্তির অভিসন্ধি নিয়ে সে দলে-যোগ দেয় নি।

বোমারুদের দলে নরেন্দ্র ছিল নবাগত, বিশেষ কোনও খোঁজ খবর সে রাখত না। জেলে আসার পরেই যেন সে দলের সংগঠন সম্পর্কে অতিমাত্রায় অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়ল। বাঙ্গলা ছাড়া বিপ্লবীদের আর কোথায়ও কেন্দ্র আছে কিনা, থাকলে সেখানকার নেতাদের নাম কি, এই সব অনেক কিছুরই সে খোঁজ নিতে লাগল। নরেনের আচরণে বিপ্লবীদের সন্দেহ হল। সত্যের চেয়ে সে মিথ্যা খবরই পেল বেশী।

বিপ্লবীদের সন্দেহই শেষ পর্য্যন্ত সত্য হল। মামলার শুনানী আরম্ভ হওয়ার দু' চার দিন পরেই নরেন রাজসাক্ষী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াল। তার সাক্ষ্যের ফলে আবার নূতন করে খানাতল্লাস আরম্ভ হল।

রাজসাক্ষী হওয়ার পর থেকে নরেনের সম্পর্কে বিপ্লবীদের ভাবগতি সুবিধা নয় বুঝে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাকে নিরাপত্তার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ইউরোপীয় প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখল। পাছে কেউ তার ওপর আক্রমণ করে এই ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সব সময়েই সন্ত্রস্ত থাকত। এই সতর্কতার আবহাওয়ার মাঝেই একদিন আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা নাটকের চরম পরিণতি ঘনিয়ে এল।

জেলে বসে একদিন বিপ্লবীরা কার কি রকম দণ্ড হবে তা নিয়ে গবেষণা করছিল। কানাইলাল দত্ত বলল, 'খালাসের কথা ভুলে যাও—সব বিশ বছর করে কালাপাণি।' শচীন সেনের কথাটা মনঃপূত হল না। সে বললে, 'বিশ বছরের মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।' কানাইলাল কিছু-

ক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'দেশ মুক্ত হোক, আর না হোক, আমি হবো। বিশ বছর জেল খাটা আমার পোষাবে না।'

এর ছু'এক দিনের মধ্যেই কানাইলাল সাংঘাতিক রকমের পেটব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। জেলের ডাক্তার এসে পরীক্ষার পর তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

আলিপুর ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে পড়ে মেদিনীপুরের বিপ্লবী কর্ম্মী সত্যেন বসুও ইতিপূর্ব্বেই জেলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙ্গলার নব-জাতীয়তা-বোধের অন্যতম উদ্গাতা প্রাতঃস্মরণীয় রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রের সম্পর্কে মাতুল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয় তাতে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রনাথ নেতৃস্থানীয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরে অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হলে এঁরা মেদিনীপুরেও একটা গুপ্ত-সমিতি গড়ে তোলেন। সত্যেনদের বাড়ীর লাগোয়া একটা চালায় এই গুপ্ত সমিতির বৈঠক হত, এখানে ভূপেন্দ্রনাথ 'বর্ত্তমান রণনীতি' আর 'মুক্তি কোন পথে' এই ছু'খানা বই পড়ে শুনিয়ে সদস্যদের জঙ্গী দেশাত্মবোধে দীক্ষা দিতেন। মেদিনীপুরে থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বারীন্দ্রকুমারের 'যুগান্তর' পত্রিকার এজেন্টগিরিও করতেন এবং এর ফলে মেদিনী-পুরের তরুণ সমাজে বিপ্লব-মন্ত্র প্রচারের পথ বেশ সুগম হয়। প্রকাশ, ক্ষুদিরাম যখন মেলায় রাজদ্রোহাত্মক পুস্তিকা

প্রচার ও সিপাইকে প্রহারের অভিযোগে ধরা পড়ে বিচারার্থ আদালতে নীত হল, তখন, সরকারপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথকে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু এতে অস্বীকৃতির দরুণ সত্যেন্দ্রনাথের সরকারী চাকুরী চলে যায়। সত্যেন বসু কাশরোগগ্রস্ত বলে আগে হতেই হাসপাতালে ছিলেন। পেটব্যথার নাম করে কানাইলালও এসে হাসপাতালে জুটল।

কানাইলালের বাড়ী ছিল চন্দননগর। ইনি ছিলেন উপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী, উভয়েই চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। এঁদের সংস্রবে থাকার সন্দেহে পুলিস ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়কেও গ্রেপ্তার করেছিল।

কানাইলাল হাসপাতালে যাওয়ার তিন চার দিন পরের কথা। খুব সকালে, অন্যান্য বন্দীরা সবে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুচ্ছে, এমনি সময় দূরে দু' একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। কয়েদী ও পাহারাদারেরা খানিক ছুটাছুটি করল বটে, কিন্তু কি হয়েছে তা কেউই বলতে পারল না। শেষ পর্য্যন্ত একজন পুরানো চোর এসে বন্দীদের কাছে আসল খবরটা পৌঁছে দিয়ে গেল। 'কানাইবাবু নরেন গোঁসাইকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।'

প্রায় পনের মিনিট পরে জেলের পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল। জেলের পাহারাদারেরা চারদিক থেকে ছুটে হাসপাতালের দিকে গেল। কিছুক্ষণ পরে তারা কানাই ও সত্যেনকে নিয়ে চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর দিকে গেল।

নরেন্দ্র গোস্বামী হত্যা আজ সত্য মিথ্যা বহু কাহিনীতে ভারাক্রান্ত, তবে এসম্পর্কে মোটামুটিভাবে যেটুকু তথ্য আহরণ করা যায় তা এই যে, দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধিতে ভুগে সত্যেন্দ্রনাথ জীবনে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। নরেন্দ্রকে হত্যার সঙ্কল্প বোধ হয় তারই মাথায় প্রথম দেখা দিয়েছিল। সত্যেনের সঙ্কল্পের কথা অবগত হয়ে কানাইলাল পেটব্যথার অজুহাত তুলে পিস্তলসহ হাসপাতালে আসে। হাসপাতালে পিস্তল কোন্ পথে এসেছিল তা আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নি। বাইরে থেকে বন্দীদের জন্য তাদের আত্মীয় বন্ধুরা যে সব কাঁঠাল বা ঘিয়ের টিন পাঠিয়ে দিত, তা সাহেব ডাক্তার পরীক্ষা করে দিত, কাজেই কাঁঠালের জঠরে দু'দু'টা রিভলভার চালানের কাহিনী সহজবিশ্বাস্য নয়। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'কর্তৃপক্ষের চক্ষুর অগোচরে জেলের মধ্যে গাঁজা, গুলি, আফিং, সিগারেট সবই যে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে, সে রাস্তা দিয়ে পিস্তল যাওয়া ত বিচিত্র নয়!' ঘুষের অসাধ্য কি!

কানাই হাসপাতালে আসার পর সত্যেন নরেন্দ্রকে বলে পাঠালেন যে, জেলের কষ্ট তাঁর সহ্য হচ্ছে না, তিনিও রাজসাক্ষী হবেন। পুলিশের কাছে কি কি বলতে হবে, সে বিষয়ে আগে দু'জনে পরামর্শ করে নিতে পারলে আদালতে জেরার সময়ে কোনও কষ্ট পেতে হবে না। নরেন সত্যেনের ফাঁদে পা দিল। ঘটনার দিন ভোরে সে একজন ইউরোপীয়

প্রহরী সঙ্গে নিয়ে সত্যেনের সঙ্গে দেখা করতে এল। কথা বলতে বলতে সত্যেন পিস্তল বের করে নরেনকে গুলী করলে সে ঘর হতে ছুটে বাইরে যায়। পালাবার সময়ে তার পায়ে একটা গুলী লেগেছিল কিন্তু আঘাত তত সাংঘাতিক হয় নি।

পিস্তলের শব্দ শুনে কানাইলাল হাসপাতালে নীচের তলা হতে ওপরে ছুটে এল। ইউরোপীয় প্রহরী বাধা দিতে গিয়ে হাতে গুলী খেল। ইতিমধ্যে নরেন নীচে এসে হাসপাতাল হতে বেরিয়ে পড়ে। কানাই নীচে হাসপাতালের গেটে এসে দেখল প্রহরী দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কানাই তার দিকে পিস্তল তুলতেই সে নরেন্দ্রের উদ্দেশ দিয়ে দিল। দূর হতে নরেনকে দেখতে পেয়ে কানাই গুলী করতে করতে ছুটতে লাগল। পিস্তলের শব্দে জেলার, ডেপুটি জেলার প্রভৃতি ছোট বড় সমস্ত কর্তারাই বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু কানাইএর রুদ্ররূপ দেখে অগ্রসর হতে কারও ভরসা হল না। কানাইএর হাত হতে গুলী খেতে খেতে নরেন জেলের কারখানার দরজায় আছাড় খেয়ে পড়ল। গুলী যখন ফুরিয়ে গেল, তখন সান্ত্রীরা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।

নরেন গোঁসাইর হত্যা সে যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিতে এক মহাবিস্ময়! মৃত্যুকে স্থির-নিশ্চিত জেনেও যে মানুষ দুঃসাহসিকতার অভিযানে বেরোতে পারে, তা ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে প্রথম প্রমাণ করল সত্যেন্দ্র আর কানাইলাল। বিপ্লবাদর্শে দীক্ষিত মানুষের কাছে জীবন হতে

মৃত্যুর যে পৃথক কোনও অর্থ নেই, কানাই ও সত্যেন তা ইংরাজের তৈরী ফাঁসিকাষ্ঠের গায়ে রক্তাক্ষরে লিখে রেখে গেল।

মৃত্যুকে কানাইলাল কিভাবে গ্রহণ করেছিল? সেই দুঃখব্রতী মরণজয়ীর এই পৃথিবী হতে বিদায়ের প্রাক্কালে কারাপ্রকোষ্ঠের অন্ধকারে যাঁরা তার মহিমান্বিত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাদের একজনের কথায়ই এই কাহিনী শেষ করব।

'আমরা যখন বাহিরে ঘুরিতাম তখন কানাই ও সত্যেনের কুঠরীর দরজা বন্ধ থাকিত। একদিন দেখিলাম কানাইলালের দরজা খোলা রহিয়াছে। আমরা সেদিকে যাইবার সময়ে প্রহরীও বাধা দিল না। পরে শুনিলাম যে কানাইলালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য প্রহরীরা দয়া করিয়া কানাইকে দেখিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

'যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবার মত জিনিষই বটে। আজও সে ছবি স্পষ্টই মনের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে, জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাইএর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটি দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই, প্রফুল্লকমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকূটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে সে-ই পরমহংস। কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া

গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই যেন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে। আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসিকাঠ, সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন! প্রহরীর কাছে শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ষোল পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া, শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে যাহা পতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবান অনন্ত, মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত।

'তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজ শাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না।'

নজরুল লিখেছেন—

'মৃত্যু ওরা জয় করেছে ভাবনা কিসের,

আবজমজম্ আনলে ওরা আপনি পিয়ে

কলসী বিষের।'

মৃত্যুর মধ্যে মানুষ যখন অমরত্বের সন্ধান পায়, জীবনের কোনও আকর্ষণই তখন তাকে পিছু টেনে রাখতে পারে না। বুড়া বালংএর তীরে চাষাখন্দের প্রান্তরে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা নিজ দেহের অস্থি ও শোণিত দ্বারা যে স্মারকস্তম্ভের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ক্ষয়ধর্ম্মী কাল তাকে স্পর্শ করতে পারে নি, মৃত্যুর মালিন্য তাকে গ্রাস করতে পারে নি, জাতির চিত্তলোকে যতীন্দ্রনাথ ও চিত্তপ্রিয়ের আত্মদান চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। শহীদের নিঃশঙ্ক মৃত্যু-বরণে জাতির প্রাণভাণ্ডার জীবনের প্রাচুর্য্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

প্রথম জীবনে ভোজালির সাহায্যে বাঘ মেরে যতীন

মুখার্জি 'বাঘা যতীন' নাম পেয়েছিলেন। কিন্তু বাঘ মারাই তাঁর জীবনের সেরা গৌরব নয়, কারণ, বাঙ্গলার বিপ্লবান্দোলনের যিনি ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ শত্রু, কলিকাতার সেই পুলিস কমিশনার টেগার্টের নিকট হতে তিনি সব চেয়ে বড় অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। ময়ূর-ভঞ্জের জঙ্গলে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে টেগার্ট কলিকাতায় ব্যারিষ্টার জে, এন, রায়ের কাছে বলেছিলেন, 'আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি বটে, কিন্তু যতীন্দ্রনাথের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ট্রেঞ্চের মধ্য হতে সম্মুখ-সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন।'

বাঙ্গলার বিপ্লবান্দোলনে যতীন মুখার্জির অভ্যুদয়কে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা বলা যেতে পারে। যতীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়ী ছিল যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিনাইদহের বিষখালি গ্রামে। কিন্তু পিতা উমেশচন্দ্র যতীন্দ্রনাথের শৈশবেই পরলোকগমন করায় মাতুলালয়েই তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। যতীন্দ্রনাথের মাতুল বসন্তকুমার চাটার্জি ছিলেন কৃষ্ণনগরের সরকারী উকীল। কৃষ্ণনগর হতে এণ্ট্রান্স পাশ করে যতীন্দ্রনাথ এফ-এ পড়ার জন্য কলিকাতায় এলেন, কিন্তু পড়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁর হয়ে উঠল না। কিছুদিন সওদাগরী অফিসে চাকুরী করার পর রাইটার্স বিল্ডিংএ তৎকালীন অর্থসচিব হুর্লে সাহেবের অধীনে তিনি সরকারী চাকুরী পান।

খুব সম্ভব মুরারিপুকুরের দলের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল এবং তা জানতে পেরেই হোক, বা পুলিস রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেই হোক, গুর্লে যতীন্দ্রনাথকে সরকারী চাকুরী ছাড়তে নির্দ্দেশ দেন। এই সময়ে শিলিগুড়িতে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনজন শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের সঙ্ঘর্ষ এবং যতীন্দ্রনাথের হাতে তাদের লাঞ্ছনাও তাঁর চাকুরী যাওয়ার অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন।

যে ভাবেই হোক, চাকুরী যাওয়া যতীন্দ্রনাথের নিকট অনেকটা শাপে বর হল, কারণ, এখন হতে তিনি অনেকটা স্বাধীনভাবেই দেশের মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলেন। পুলিস সুপারিনটেণ্ডেট শামসুল আলম আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় সরকারপক্ষে তদ্বির-তদারক করে সে যুগে খুব অখ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী শামসুল আলম কলিকাতা হাইকোর্ট ভবনে রিভলভারের গুলীতে নিহত হলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত নামে এক যুবক ধরা পড়লে পুলিসের নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করে সে এক বিবৃতি দেয়। এই বিবৃতিতে দলের নায়ক হিসেবে যতীন্দ্রনাথের নামও প্রকাশ পায়।

বীরেন্দ্রনাথের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে পুলিস হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা নামে এক বিরাট মামলা খাড়া করল এবং যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চাশ জন এতে আসামী হলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মামলা টিকল না, প্রায় বছরখানেক মামলা চলার পর আসামীরা সকলেই মুক্তি লাভ করলেন।

মামলায় মুক্তিলাভের পর যতীন্দ্রনাথ মাতুলালয়ে গিয়ে মাতুলের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতে থাকেন এবং পুনরায় জীবিকার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে যশোর-ঝিনাইদহ লাইট রেলওয়ে নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হলে, যতীন্দ্রনাথ রেলওয়েতে ঠিকাদারী কাজ আরম্ভ করে দিলেন। এই কাজে তাঁর যথেষ্ট টাকা প্রাপ্য হয়, কিন্তু কোনও কারণে প্রাপ্য টাকা আদায় করতে না পেরে তিনি ইংরাজের ওপরে আরও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন।

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমানে ও কাঁথিতে প্রবল বন্যা হয়। যতীন্দ্রনাথ এই সময়ে নিজের সঙ্গীদের নিয়ে আর্ত্তসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এদিকে, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাখন সেন, রাম মজুমদার প্রভৃতিও বন্যায় সেবাকার্য্য পরিচালনা করছিলেন। হ্যারিসন রোডের ওভারটুন হলে শ্রমজীবী সমবায় নামে এক প্রতিষ্ঠানে বসে এঁরা নিজেদের কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। যতীন্দ্রনাথও সেখানে গিয়ে এঁদের সহিত মিলিত হলেন। এই সেবাকার্য্য উপলক্ষে ঢাকা অনুশীলন সমিতির কর্ম্মীরাও এসে বর্দ্ধমানে এবং কলিকাতায় মিলিত হন। ফলতঃ বর্দ্ধমান ও কাঁথির বন্যা বাঙ্গলার বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সংহতির বিশেষ সহায়ক হয়।

বর্দ্ধমানের বন্যার প্রায় সমকালেই ইউরোপে মহাযুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯১১ সালে ফোন্ বার্ণহার্ডির 'Germany and the next war' নামে একখানা বই বের হয়। বার্ণহার্ডি

তাঁর পুস্তকে খোলাখুলিভাবেই লিখেছিলেন যে, আসন্ন যুদ্ধের কালে বাঙ্গলার বিপ্লবীরা বৃটিশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাবে বলে বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। আসলেও ব্যাপারটা তাই দাঁড়াল। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল তখন জার্মানীতে তারকনাথ দাস, হরদয়াল, চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বরকতুল্লা, হেরম্বলাল গুপ্ত প্রভৃতি বিপ্লবীকে নিয়ে পাকাপোক্তভাবে একটা দল গড়ে উঠেছে এবং জার্মানী ও বাঙ্গলার বিপ্লবীদের মধ্যে সংযোগও স্থাপিত হয়েছে। সাহায্য দেওয়া-নেওয়ার সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গেল। বাটাভিয়ায় বাঙ্গালী বিপ্লবীদের একটা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। আমেরিকা তখন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আমেরিকায় যে সকল জার্মানরা ছিল তাদের মারফৎ বাটাভিয়া হয়ে ভারতে অস্ত্র ও অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা হল।

বাঙ্গলায় প্রস্তুতি আরম্ভ হল। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লব-নায়কদের এক গোপন সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন। উত্তরপাড়ায় এক ভাঙ্গা শিবমন্দিরে এই সম্মেলন হয়। যতীন্দ্র-নাথ ও মানবেন্দ্রনাথ রায় এই বৈঠকে যোগ দেন। সমগ্র ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে স্থিরীকৃত হয়।

এই সময়ে উত্তর ভারতে গদরদের নেতৃত্বে যে ব্যাপক বিপ্লব-প্রস্তুতি চলছিল, একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসমসাহসিক বাঙ্গালী তার সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং বাঙ্গলার বিপ্লবীদের সঙ্গে রীতিমত সংযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। ভারতের এই অবিস্মরণীয় মুক্তি-যোদ্ধার নাম রাসবিহারী বসু।

যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাসবিহারীর চন্দননগরে ও বারাণসীতে বারকয়েক সাক্ষাৎ হয়।

বৈপ্লবিক সংগঠন, নেতৃত্ব, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দিক দিয়ে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান। এর ফলে, যতীন্দ্রনাথ নিজে কোনও বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের নেতৃত্ব-ভার ধীরে ধীরে তারই ওপর গিয়ে পড়ল। কলিকাতা অনুশীলনের কর্ম্মীরা এবং বারীন্দ্রের যে সকল সহকর্ম্মী পুলিসের নজর এড়িয়ে বাইরে ছিলেন তাঁরা সকলেই যতীন্দ্রনাথের দলে ভিড়লেন। এইভাবে বরিশালের নরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মাদারীপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস, উত্তর বঙ্গের যতীন রায় ও যোগেন দে সরকার, কলিকাতা অনুশীলনের যাদুগোপাল মুখার্জি ও হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, খুলনার সতীশ চক্রবর্ত্তী, যশোহরের বিজয় রায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), অতুল ঘোষ প্রভৃতি সে যুগের বহু খ্যাতনামা বিপ্লবী ও সংগঠক এসে যতীন্দ্রনাথের দলে যোগ দিলেন।

আসন্ন বিপ্লবের জন্য যতীন মুখার্জি এবার তৈরী হতে লাগলেন। জার্মানী অর্থও পাঠাবে, কিন্তু সে অর্থ হাতে না পৌঁছান পর্য্যন্ত বিপ্লব-প্রস্তুতি বন্ধ রাখলে চলবে না। অ্যাম্বুলান্স বাহিনী তৈরী করতে হবে, সাঙ্কেতিক-বার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হবে, পদাতিক ও অশ্বারোহীদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদান ও অস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞ

করতে হবে, কাজেই, অর্থ সংগ্রহের অন্য পন্থা দেখতে হল।

এই সময়ে খিদিরপুর ডক হতে বিখ্যাত অস্ত্রব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর পঞ্চাশটা মজার পিস্তল ও বিপুল পরিমাণ কার্ত্তুজ উধাও হওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অপহৃত পিস্তলগুলি বাঙ্গলার ন'টি বিপ্লবী দলের মধ্যে বন্টিত হল। এই অস্ত্রের সাহায্যে যতীন্দ্রনাথের লোকেরা গার্ডেনরীচে বার্ড কোম্পানীর কতিপয় কর্ম্মচারীর নিকট হতে আঠেরো হাজার টাকা লুটে নিল, বেলেঘাটায় এক চাউল ব্যবসায়ীর আড়ৎ হতেও বাইশ হাজার টাকা লুন্ঠিত হল। কলিকাতায় এই প্রথম ট্যাক্সি ডাকাতির সূচনা।

এই ডাকাতির পর পুলিশ যতীন্দ্রনাথের দলকে গ্রেপ্তারের জন্য উঠে পড়ে লাগে। নরেন ভট্টাচার্য্য এই সম্পর্কে ধরা পড়েন, কিন্তু জামীনে মুক্ত থাকার কালে তিনি ভারত হতে সরে পড়েন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে সুরেশচন্দ্র মুখার্জ্জি নামক একজন গোয়েন্দাবিভাগীয় ইন্সপেক্টর কলিকাতায় কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে যতীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করলে রিভলভারের গুলীতে নিহত হন।

এদিকে, বাঙ্গলার বিপ্লবীদের অভ্যুত্থানে সাহায্যের জন্য জার্ম্মানরা এই সময়ে 'মাভেরিক' ও 'হেনরী' নামক দু'খানা জাহাজযোগে বাঙ্গলায় সুন্দরবন অঞ্চলস্থ রায়মঙ্গলে এবং নোয়াখালিতে হাতিয়ায় অস্ত্র সরবরাহের জন্য বারংবার চেষ্টা করতে থাকে। ভারত হতে অন্তর্দ্ধানের পর নরেন ভট্টাচার্য্য

এই সময় মার্টিনের ছদ্মনামে বাটাভিয়ায় থেকে অস্ত্র আমদানীর জন্য জার্ম্মানদের সহযোগিতায় কাজ করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র আমদানীর সমগ্র চেষ্টা ব্যর্থ হল, অস্ত্র বোঝাই জার্ম্মান জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ধরা পড়ে গেল। মার্টিন নাবিকের ছদ্মবেশে আমেরিকায় পালিয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে বন্দী হলেন।

এদিকে, বেলেঘাটায় ডাকাতির পর যতীন্দ্রনাথ পাথুরেঘাটায় এক বাড়ীতে কয়েকজন সঙ্গীসহ আত্মগোপন করছিলেন। নীরদ হালদার নামক এক ব্যক্তি অকস্মাৎ সেই বাড়ীতে উপস্থিত হলে যতীন্দ্রনাথ সতর্কতা হিসাবে তাকে গুলী করে হত্যা করলেন। এর পরই তিনি সঙ্গীদের নিয়ে বাড়ী ছেড়ে পলায়ন করলেন।

এর পর কলিকাতায় থাকা যতীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। যতীন্দ্রনাথের বন্ধুরা তাঁর জন্য আশ্রয়স্থানের সন্ধান করে বেড়াতে লাগল, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার দত্ত প্রভৃতির পরামর্শও নেওয়া হল। কিন্তু কেউই কোনও সুরাহা করতে পারলেন না। বন্যার সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু পলাতক বিপ্লবীকে আশ্রয় দানে তিনিও অসামর্থ্য জানালেন।

অবশেষে আশ্রয় মিলল। বাগনান স্কুলের হেডমাষ্টার অতুলচন্দ্র সেন ঐ অঞ্চলের বিপ্লবীদলের নায়ক ছিলেন। অমর চট্টোপাধ্যায় ও মাখন সেনের উদ্যোগে বাগনানে যতীন্দ্রনাথকে

আশ্রয় দানের ব্যবস্থা হল। যতীন মুখার্জি চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাশ গুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল সহ বাগনানে গেলেন। সেখানে এক বোর্ডিংএ রাত্রি যাপনের পর রাত্রিশেষে কটক ট্রাঙ্ক রোডে এক ধান ও কাপড়ের ব্যাপারীর টিনের দোকান-ঘরে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল। এই ব্যাপারীর নাম ছিল চন্দ্র সামুই।

এখানে দশ-বার দিন অবস্থানের পর একজন মাহিষ্য যুবকের সহায়তায় তাঁরা পদব্রজে রূপনারায়ণ নদের তীরবর্ত্তী বেণাপুর গ্রামে গেলেন। সেখান হতে নদী পার হয়ে তাঁরা তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে দু'দিন কাটালেন। এর পর তাঁরা ছদ্মবেশে এই অঞ্চলের গুইগড়, দোরো, মহিষাদল, কুমারাড়া প্রভৃতি গ্রামে ঘুরে বেড়ান। যতীন্দ্রনাথ নাকি এই সময়ে ছদ্মপরিচয়ে এখানকার একটা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন।

কাঁথির বন্যার সময়ে কাঁথি স্কুলের শিক্ষক প্রমথ ব্যানার্জির সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ঘটেছিল। যতীন্দ্রনাথ এর পর কাঁথিতে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সহ কিছুদিন তাঁর আশ্রয়ে রইলেন। অতঃপর তাঁরা ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে বালেশ্বরে যাত্রা করলেন।

এ সময়ে পুলিস কলিকাতায় দু'টি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পেল। প্রতিষ্ঠান দু'টি হচ্ছে 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স' এবং 'শ্রমজীবী সমবায়'। পুলিস জানতে পারল যে এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জার্ম্মানরা রীতিমত চিঠিপত্র বিনিময় করে

থাকে এবং মালপত্র ও টাকাও এখানে আসে। পুলিস হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের মালিক হরিকুমার চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী আটক রাখল। কিন্তু শ্রমজীবী সমবায়ের মালিক অমর চাটার্জি উধাও হলেন, পুলিস তাঁর উদ্দেশ পেল না।

কলিকাতায় এই সকল তল্লাসের কালে পুলিস বালেশ্বরের একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম পেল। এই প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামক এক সাইকেলের দোকান। পুলিস জানল যে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম অনেকটা হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের শাখা হিসাবে কাজ করে থাকে। এর পর পুলিস সেখানেও হানা দিল।

১৯১৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পুলিস বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম তল্লাস করে। এখান থেকে তারা খোঁজ পেল যে বিপ্লবীরা ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রে বালেশ্বরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিল্‌বি কলিকাতা পুলিসের টেগার্ট ও বার্ডকে নিয়ে ময়ূরভঞ্জের মহুলদিয়াতে উপস্থিত হলেন। তাঁরা যখন ঐস্থানে পৌঁছোলেন তখন ভোর হতে সামান্য বাকী আছে। স্থানীয় দু'এক জন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, জনকয়েক 'সাহেব' কিছুদিন হতেই ঐ অঞ্চলে বাস করছেন। এই 'সাহেব'রা বন্দুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ চর্চ্চা করে থাকেন এবং মহুলদিয়ার জঙ্গলে পশুপক্ষী এবং জীবজন্তু শীকার করেন।

যা হোক, অনেক কষ্টে একজন পথ-প্রদর্শক যোগাড় হল। পুলিসদলকে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে সে দূর হতে 'সাহেব'দের কুটীর দেখিয়ে দিল।

পুলিস যখন কুটীরের দ্বারে পৌঁছুল তখন দেখা গেল তার দ্বার বন্ধ। অতর্কিত আক্রমণের জন্য পুলিস তৈরী হয়ে নিল, তার পর বিপ্লবীদের অস্ত্রত্যাগ করে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু ঘর হতে কোনও সাড়া এল না। অতঃপর দরজা খোলবার চেষ্টা করতে বিনা বাধায়ই তা খুলে গেল। ঘরে কেউই নাই! তাকের ওপর কতকগুলো ছেঁড়া কাগজপত্র, ওষুধের শিশি, কয়েকখানা পরিধেয় বস্ত্র। হতাশ হয়ে, দু'জন লোককে ঘর পাহারায় রেখে পুলিসের দল কাপ্তিপদা ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে ছুটল।

যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহচরেরা অত্যন্ত সতর্কভাবেই ঐ অঞ্চলে বসবাস করছিলেন, কাজেই তাঁদের ধরা খুব সহজ ছিল না। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গী-চতুষ্ঠয়—চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ এক জায়গায় অবস্থান করতেন না, তিনজন মহুলদিয়ায় এবং দু'জন তার বার মাইল দূরে তালবাঁধ নামক স্থানে থাকতেন। স্থানীয় লোকদের তাঁরা বুঝিয়েছিলেন যে কৃষি ও পশু পালনের দ্বারা জীবিকার্জ্জনের জন্য তাঁরা সেখানে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তারা জমিতে চাষও করতেন। কাজেই, স্থানীয় লোকদের অবিশ্বাসের কোন কারণ ঘটে নি।

গভীর রাত্রে যতীন্দ্রনাথ খবর পান যে হাতী চড়ে তিন জন সাহেব তাঁর কুটীরের অদূরবর্ত্তী রাস্তা ধরে

কাপ্তিপদার দিকে গেছেন। ব্যাপারটা যে অস্বাভাবিক তা বুঝতে যতীন্দ্রনাথের বিলম্ব হল না। তিনি তৎক্ষণাৎ তালবাঁধে লোক পাঠালেন এবং কোথায় মিলিত হওয়া যাবে এই সঙ্কেত দিয়ে রাত্রেই কুটীর ত্যাগ করলেন। সহচরদের সঙ্গে মিলনের পর ৮ই সমস্ত দিনরাত্রি তাঁরা পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে। সমর্থ হন। পরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তাঁরা এক দোকানে উপস্থিত হলেন। সেখানে খাবার কেনার কালে হঠাৎ একজন লোক এসে হাজির হল। লোকটি বলল যে, সম্প্রতি ঐ অঞ্চলে যে সকল ডাকাতি হয়েছে, এই সকল হাফ-প্যাণ্টপরা লোকদের তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে; কাজেই পুলিসে খবর দেওয়া উচিত। যতীন্দ্রনাথ বললেন, তাঁরা শিকারী, পথ ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসেছেন, ডাকাতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তখন সেখানে আরও লোক এসে জমেছে। যতীন্দ্রনাথের কথা কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। অনেকেই সেখানে রয়ে গেল এবং যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহচরদের পিছু পিছু চলল। সেদিন ৯ই সেপ্টেম্বরের সকাল।

যতীন্দ্রনাথ যত অগ্রসর হতে লাগলেন, তাঁর পিছনকার জনতা ততই আয়তনে বাড়তে লাগল। ভয় দেখিয়ে লোক তাড়াবার চেষ্টায় মনোরঞ্জন একবার গুলী ছুঁড়লে, দুর্ভাগ্যক্রমে এক ব্যক্তি তাতে আহত হল। তখন পিছনকার জনতা আর একটু বেশী ব্যবধান রেখে তাদের পিছু পিছু চলতে লাগল। ফলে তাঁদের ধরা পড়বার সম্ভাবনা আরও প্রবল হয়ে উঠল।

এর পর তারা বুড়া বালং নদী পার হয়ে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে পুলিস দল এসে জঙ্গল ঘেরাও করে ফেলল। যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন যে এবার আর তাঁদের নিষ্কৃতি নাই। পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ অপেক্ষা সম্মুখ-সংগ্রামে মৃত্যুবরণই তিনি শ্রেয় বলে মনে করলেন। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা বুড়া বালং নদীতীরে চাষাখন্দ নামক স্থানে বালুকারাশির মধ্যে পরিখা খনন করে লড়াই আরম্ভ করলেন। বিপ্লবীদের অগ্নিবর্ষণ-কৌশলে পুলিস বহুক্ষণ যাবত অগ্রসর হতে পারল না, তাদের ক্ষতিও কম হল না। কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। যতীন্দ্রনাথের দেহে কয়েকটি গুলী লাগায় তিনিও গুরুতররূপে আহত হলেন। অপর তিনজন বিপ্লবীও অল্পবিস্তর আহত হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ অতঃপর সঙ্গীদের যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। গায়ের চাদর খুলে শ্বেতপতাকা হিসাবে উড়ান হল।

চিত্তপ্রিয় আহত হওয়ার কিছুকাল পরেই মারা গেলেন। যতীন্দ্রনাথকে কটক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তিনি পরদিন মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুলিসের কাছে বলেছিলেন যে, সমস্ত কিছুর জন্য তিনিই দায়ী। টেগার্ট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কিছু বলবেন?' যতীন মুখার্জি বললেন, 'Yes, tell the people of Bengal that Chittapriya Rai and I sacrificed our lives in vindicating the honour of Bengal !'

নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের বিচারে ফাঁসির হুকুম হল, জ্যোতিষ পালের হল দশ বছর দ্বীপান্তর। নীরেনের পক্ষ-সমর্থক উকীল উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছেন যে ফাঁসির মঞ্চে উঠে নীরেন্দ্র প্রায় আধঘণ্টাকাল ভারতে বৃটিশের শোষণ ও অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা করেন। কটক জেলে নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয়ে যায়। জ্যোতিষ পাল কিছুদিন আন্দামানে থাকার পর পাগল হয়ে যায়। অতঃপর তাকে বহরমপুর জেলে রাখা হয় এবং সেখানে তার মৃত্যু ঘটে।

এখানে যতীন্দ্রনাথের মরণজয়ী সঙ্গীদের বিষয়ও কিছু বলা দরকার। চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশ গুপ্ত, এরা তিনজনেই মাদারীপুরের; চিত্তপ্রিয়ের বাড়ী খালিয়া গ্রামে, আর মনোরঞ্জন ও নীরেনের বাড়ী খৈয়ারভাঙ্গা গ্রামে। তিনজনেই ছিল মাদারীপুর স্কুলের ছাত্র। মনোরঞ্জন আর নীরেন উভয়ে ছিল আবার পরস্পরের জ্ঞাতি-ভ্রাতা। মাদারীপুর স্কুলে ছাত্রাবস্থায়েই এরা বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে। ১৯১৩ সালের প্রথম দিকে গবর্ণমেণ্ট ফরিদপুর জিলায় কয়েকটা স্বদেশী ডাকাতিকে উপলক্ষ্য করে যে বেড়াজাল ফেললেন তাতে পূর্ণ দাস, কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন প্রভৃতি সাতাশজন ধরা পড়লেন। এই-ই ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা। কিন্তু আট-নয় মাস মামলা চালানোর পর গবর্ণমেণ্ট মামলা উঠিয়ে নিতে বাধ্য হন।

মুক্তি পাওয়ার পর চিত্তপ্রিয়, নীরেন ও মনোরঞ্জনের আর

মাদারীপুরের স্কুলে স্থান হল না। ১৯১৪ সালের শেষভাগে তারা তিন জনেই কলিকাতায় এল। চিত্তপ্রিয় কলিকাতায় কেশব একাডেমিতে ভর্ত্তি হল, নীরেন ও মনোরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায় অনেক ধরাধরির পর স্থান পেল। কিন্তু গোয়েন্দারা তাদের পিছনে লেগেই রইল।

ইতিমধ্যে যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে বাঙ্গলার বিপ্লবীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। পূর্ণ দাস চিত্তপ্রিয়, নীরেন ও মনোরঞ্জনকে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে গিয়েছেন। এর পর গার্ডেনরীচে ও বেলেঘাটায় যে দু'টা ট্যাক্সি ডাকাতি হয় তাতেও সম্ভবতঃ এরা তিনজন অংশ গ্রহণ করেছিল। এ সময় চিত্তপ্রিয়ের নামে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের কাছে আই-বি ইনসপেক্টর সুরেশ মুখার্জি চিত্তপ্রিয়কে দেখে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য মোটর হতে নামেন। এই সময়ে পিস্তলের গুলীতে তিনি নিহত হন। কারও কারও মতে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মনোরঞ্জন ও নীরেন জড়িত ছিল। পরে পাথুরেঘাটায় নীরদ হালদারকে হত্যার সময়েও চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ চারজনেই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল। এর পরেই বালেশ্বরের দুর্গম পথে বিপ্লবীদের যাত্রা আরম্ভ হয়। চাষাখন্দের প্রান্তরে যেখানে যতীন মুখার্জির দলের সঙ্গে পুলিসের যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে নাকি ছোট এক স্মারকস্তম্ভ স্থাপন করে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট লিখে রেখেছেন, 'Here lies notorious Chittapriya'। বিদেশী শাসকের কাছে চিত্তপ্রিয় 'notorious' আখ্যা লাভ করবে

তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ভারতের আত্মা চাষাখন্দের প্রান্তরে সেই মুক্তি-পাগল মরণজয়ীর স্মারক-স্তম্ভকে স্বাধীনতার দুর্গম পথে জাতির অভিসারের স্মৃতি-ফলক রূপেই চিরকাল জ্ঞান করবে।

দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা
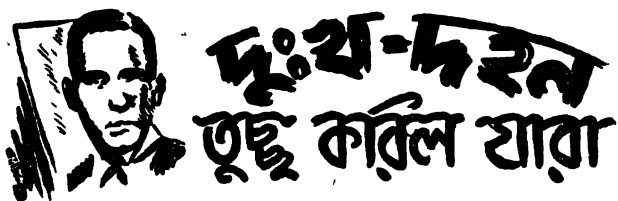
যতীন্দ্রনাথ-মানবেন্দ্র-যাদুগোপালের নেতৃত্বে বঙ্গোপসাগরের উপকূলব্যেপে যখন বিপ্লব-প্রস্তুতি চলছিল, তখন ঠিক তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর ভারতের আকাশেও ঘনকৃষ্ণ মেঘ জমে উঠছিল। বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে সুযোগ বিপ্লবীরা সন্ধান করে ফিরছিল, ১৯১৪ সালে তা এল। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ইংরাজ ভারত ও ব্রহ্মকে প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় রেখে পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হল। বিপ্লবীরা এই সুযোগ ছাড়ল না। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন বহু প্রতিভাশালী ভারতীয় বিপ্লবী জার্ম্মানীতে জমায়েত হয়ে ভারতে বিপ্লব আরম্ভের জন্য অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহের পন্থা নিয়ে জার্ম্মাণ রাষ্ট্র ও সমরনায়কদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সুরু করেছেন। জার্ম্মানী হতে আমেরিকা ও বাটাভিয়ার পথে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে রীতিমতভাবে বার্ত্তা আদান প্রদানের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

এই সময়ে যে সকল ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতের অধিবাসীদের মন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল তাও এখানে বলা দরকার। উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমভাগে পাঞ্জাবের অধিবাসী বহু শিখ জীবিকার সন্ধানে স্বদেশ ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করে এবং অনেকে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আমেরিকা ও কানাডায়ও আশ্রয় নেয়। এইভাবে বিংশ শতকের প্রথম ভাগে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় জীবিকান্বেষী শিখদের ছোট-খাট কয়েকটা উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

১৯০৭ সালে যে বিশ্বব্যাপী অর্থ সঙ্কট ও বেকার সমস্যা দেখা দেয় তা যুক্তরাষ্ট্রকেও গ্রাস করে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার মজুররা ভারতীয় মজুরদের অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য করতে সুরু করে, তাদের ওপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করে। আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের তুষ্ণীভাব এবং বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের বৃটিশ প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় ঔদাসীন্য অবস্থাকে আরও জটীল করে তোলে এবং ভারতীয় শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার অব্যাহত করে রাখে। এই ঘটনাই আমেরিকাবাসী শিখদের সংগঠনের পথে চলবার ইঙ্গিত দেয় এবং গদরদলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

বর্ণাভিমানী শ্বেতজাতির দ্বিতীয় আঘাত হল কানাডা সরকারের বিদেশী আমদানী নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯১০ সাল)। এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে ভারতবাসীদের কানাডা গমন প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ হল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষেত্রেও

নিজ প্রজাদের সম্পর্কে এইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করলেন না। কানাডা গবর্ণমেণ্টের এই বর্ণাভিজাত্যের বিরুদ্ধে শিখরা যে সংগ্রাম আরম্ভ করেন তারই পরিণতিতে 'কোমাগাতামারু' বিপর্য্যয় ও বজবজের শোণিত-ক্ষরণে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু এই সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে দলে দলে শিখ দেশে ফিরতে আরম্ভ করে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধকালীন আইনের বলে বহু শিখকে ভারতের উপকূলে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই আটক করেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যারা ইংরাজের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে নিজ প্রদেশে পৌঁছুতে পারল, তারা বৃটিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে চলল। বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রতিভা এবং শচীন সান্যালের সংগঠন-শক্তিও গদরদের বিপ্লব-প্রস্তুতির সহিত সংযুক্ত হল।

ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্যে গদর আন্দোলনই ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই বিরাট ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতায় আঠাশ জন বিপ্লবীর (রাউলাট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, পাঞ্জাবের গবর্ণর স্যার মাইকেল ও ডায়ারের মতে কুড়ি জন) প্রাণদণ্ড হয়, ছিয়াত্তর জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়, আটান্ন জনের অপেক্ষাকৃত স্বল্প মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। ইস্পাত ও অগ্নির সাহায্যে যারা অবজ্ঞাত জাতির মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছিল, মৃত্যু ও নির্ব্বাসন দ্বারা তাদের সেই স্বাধীনতা কামনার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।

উত্তর ভারতের এই বিপ্লবাগ্নিতে সেদিন ভারতের যে অশান্ত সন্তানের দল আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, আজ তাঁদের অনেকেরই সম্মুখে বিস্মৃতির যবনিকা নেমে এসেছে, কেহ বা বৈদেশিক শাসকের বিকৃত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোনক্রমে আত্ম-রক্ষা করছেন।

কিন্তু স্মৃতি যতই ক্ষীণ হোক, জাতির মনোভাণ্ডারে ত' চির-অক্ষয়। যে কর্ত্তার সিং সারাভা ফাঁসির মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়িয়েও বৈদেশিক শাসকের নিকট জীবন ভিক্ষার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'আমার যদি একাধিক জীবনও থাকত, তা হলে দেশের জন্য তার প্রত্যেকটি আমি বিসর্জ্জন দিতাম,' জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। পরবর্ত্তীকালে যে ভগৎ সিং শহীদী-ব্রতের ইতিহাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তিনি এই কর্ত্তার সিংএর সংগঠন-প্রতিভা, শৌর্য্য ও মনোবলের কাহিনী হতেই বিপ্লব-জীবনের প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে কর্ত্তার সিং ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী, যার ফলে, উনিশ বছর বয়সে তিনি গদর দলের অন্যতম নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কর্ত্তার সিংএর জন্মভূমি পাঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানা জেলায়। পঠদ্দশায় তিনি কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন এবং পরে পাঞ্জাবের অন্যান্য ভাগ্যান্বেষীদের মত আমেরিকায় যান ও গদর দল প্রতিষ্ঠার কালে তাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। বিখ্যাত গদর বিপ্লবী হরদয়ালের সম্পাদনায় যখন

সানফ্রান্সিসকো হতে 'গদর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তখন কর্ত্তার সিং তাঁর অন্যতম সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন।

'কোমাগাতামারু' জাহাজযোগে বাবা সোহন সিং ভাখ্‌না প্রভৃতি গদর নেতারা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর, কর্ত্তার সিংও অন্যান্য সহকর্ম্মীদের সঙ্গে ভারতে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে জাপানে বরকতুল্লা, সাংহাইয়ে মথুরা সিং ও হংকংএ ভগবান সিংএর নেতৃত্বে গদর দল গড়ে উঠেছে। আমেরিকা প্রত্যাগত গদররা প্রতি বন্দরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে চললেন। 'কোমাগাতামারু' জাহাজের যাত্রীদের সহিত বজবজে পুলিস ও সৈন্যদের সংঘর্ষের পর গবর্ণমেণ্ট ভারত-প্রত্যাগত শিখদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় আরম্ভ করলেন। বাবা সোহন সিং ভাখ্‌না অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই বন্দী হলেন। হিসাবে দেখা যায় যে যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে আট হাজার শিখ প্রবাস হতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এদের মধ্যে আড়াই হাজার লোককে ভারত সরকার অন্তরীণ ও চারশত জনকে কারারুদ্ধ করেন।

যা হোক, ধরপাকড়ের এই হিড়িকের মধ্যে কর্ত্তার সিং সারাভা, পিংলে, কাশীরাম প্রভৃতি পুলিশের চক্ষু এড়াতে সমর্থ হলেন। পৃথ্বী সিং বন্দীবাহী ট্রেণযোগে প্রেরিত হওয়ার কালে রাওয়ালপিণ্ডির নিকটে অদৃশ্য হলেন। উত্তর ভারতে পৌঁছে এঁরাই বিপ্লবের ইন্ধন যোগাতে আত্মনিয়োগ করলেন।

গদর বিপ্লবে রাসবিহারীর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তোলা। সৈন্যদের

মধ্যে বিঃ   । বাণী প্রচারের ভার নিলেন কর্ত্তার সিং ও পিংলে। কর্ত্তার সিং সাইকেলে চড়ে সীমান্ত প্রদেশের বান্নু হতে যুক্ত প্রদেশের বারাণসী পর্য্যন্ত সৈন্য-ছাউনীগুলোতে ঘুরে বেড়াতেন। অনেক সময় তিনি যেতেন সেনানীর ছদ্মবেশে। স্বজাতীয় সৈন্যদের কর্ত্তার সিং বলতেন, 'মরতেই যদি হয়, ত দেশের জন্য বিপ্লবের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে জীবন দাও।' এইভাবেই ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, ফৈজাবাদ, কাণপুর ও এলাহাবাদের ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তোলা হল। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী অভ্যুত্থানের দিনরূপে ধার্য্য হল। স্থির হল, প্রথমে পাঞ্জাবের সৈন্য-ছাউনী-গুলোতে বিদ্রোহ আরম্ভ হবে এবং ক্রমে তা পূর্ব্বদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তার আগেই আঘাত হানল। কৃপাল সিং নামক এক ব্যক্তি গদর দলের সংস্পর্শে থেকে পুলিসকে সমস্ত খবর যোগাচ্ছিল, অভ্যুত্থানের তারিখ নির্দ্ধারণের খবরটাও সে-ই পৌঁছিয়ে দিল। ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার খবর পেয়ে বিপ্লব নায়কেরা নির্দ্ধারিত তারিখের দু'দিন পূর্ব্বে, ১৯শে অক্টোবর অভ্যুত্থানের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার আগেই ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯শে অক্টোবর কর্ত্তার সিং যখন পঞ্চাশ জন বিপ্লবী সহ ফিরোজপুরের সৈন্য-ছাউনীতে উপস্থিত হলেন তখন সেখানে ইংরাজ সৈন্যের কড়া পাহারা বসেছে। পিংলে মীরাটের সৈন্য-ছাউনীতে ধরা পড়লেন, জগৎরাম গ্রেপ্তার হলেন পেশোয়ারে। কর্ত্তার সিংকে দলনায়কেরা বিদেশে সরে

পড়তে উপদেশ দিলেন, কিন্তু তিনি সহকর্ম্মীদের কারাগারে রেখে নিজে পলায়ন করতে অসম্মত হলেন। শেষ পর্য্যন্ত ওয়াজিরাবাদের এক সৈন্য-ছাউনীতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হল।

তার পর আরম্ভ হল বিচারের প্রহসন। ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে কর্ত্তার সিং তাঁর জবানবন্দী দিতে উঠে বললেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা ভ্রান্তি-পূর্ণ। আমরা ষড়যন্ত্র করিনি, আমাদের এই দেশে যারা শাসন-কর্তৃত্ব দখল করে বসে আছে, আমরা প্রকাশ্যভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়েছি। এর জন্য আমরা সকলেই গর্ব্ব বোধ করি।'

কর্ত্তার সিংএর বক্তব্য শেষ হবার পর বিচারক বললেন, 'তোমার এই স্বীকৃতির অর্থ কি তুমি জান?'

কর্ত্তার সিং অবিচলিত স্বরে বললেন, 'জানি, মৃত্যু।' পরের দিন যখন আদালত বসল, তখন কর্ত্তার সিং পূর্ব্বদিনের স্বীকৃতিরই পুনরাবৃত্তি করলেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর ট্রাইব্যুনাল রায় দিল। কর্ত্তার সিং, পিংলে প্রভৃতি চব্বিশ জনের ফাঁসির হুকুম হল। পরে এই দলের সতের জনের প্রাণদণ্ড রহিত করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের নির্দ্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু কর্ত্তার সিংএর প্রাণদণ্ড বজায় রইল।

১৯১৫ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রত্যুষে লাহোর সেন্ট্রাল জেলের কারাকক্ষ হতে কর্ত্তার সিং ও তাঁর ছয়'জন সহকর্ম্মীকে

বের করে আনা হল। একে একে তাঁরা হাসিমুখে ফাঁসি-কাষ্ঠে আরোহণ করলেন।

ফাঁসির প্রাক্কালে কর্ত্তার সিংকে জীবন ভিক্ষার জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছিল। কর্ত্তার সিং ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।
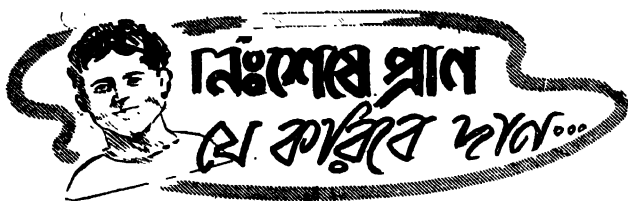
১৯২১ সালে গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ দ্বারা ভারতে প্রথম গণ-আন্দোলন প্রবর্ত্তন করলেন। এই আন্দোলন যদি অব্যাহত থাকত, জনসাধারণের সামনে যদি সুপরিকল্পিত কার্য্যসূচী উপস্থিত করা সম্ভব হত, তাহলে ভারতের মাটীতে গুপ্ত আন্দোলন বোধ হয় আর বেঁচে থাকবার খোরাক পেতনা। গুপ্ত সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্র যে খুব অপরিসর, একালের বিপ্লবী নেতারাও অনেকে তা হৃদয়ঙ্গম করে এই সময়ে কংগ্রেস প্রভৃতি গণ-প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

কিন্তু চৌরীচৌরার বিপর্য্যয়ের পর গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন তখন দেশে এক গভীর নৈরাশ্যের ছায়াপাত হল। অসহযোগ আন্দোলন দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে চণ্ডনীতি চালাচ্ছিল তাতেও অনেকের মনে গুরুতর রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। ১৯১৬ সালের পর থেকে দেশে

সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছল। চৌরীচৌরার বিপর্য্যয়ের পর বার্দ্দোলী কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় দেশে মৃতপ্রায় সন্ত্রাসবাদ আবার মাথা উঁচিয়ে উঠল।

১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট জনকয়েক যুবক কলিকাতায় শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে হানা দিয়ে রিভলবার দেখিয়ে টাকা লুটের চেষ্টা করল। টাকা না পেয়ে তারা পোষ্টমাষ্টারকে গুলী করল। কিন্তু পোষ্টমাষ্টার দৈবক্রমে বেঁচে গেল। এই সম্পর্কে বরেন ঘোষ নামক এক যুবক আদালতে অভিযুক্ত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল। পরে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করা হলে সেখানেও তার দণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয়। শেষ পর্য্যন্ত বরেন ঘোষের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রাজানুকম্পায় রহিত হয় এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে তাকে দণ্ডিত করা হয়।

১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতায় চৌরঙ্গীতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। এই দিন সকাল বেলা কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানীর মিঃ ডে নামক এক কর্ম্মচারী হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডার্সনের দোকানের সামনের শো-কেসে জিনিষ দেখবার সময় রিভলভারের গুলীতে নিহত হলেন। পর পর সাতটা গুলী তার দেহে বিদ্ধ হল। দ্বিতীয়বার গুলী লাগতেই মিঃ ডে পড়ে গেলেন, কিন্তু আততায়ী তার পরও তার দেহে পাঁচটা গুলী ছোঁড়ে।

ব্যাপারটা ঘটল এই রকমে :

মিঃ ডে লোয়ার সার্কুলার রোডের লর্ডস বোর্ডিং হাউসে

থাকতেন। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত সেদিনও তিনি প্রত্যূষে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডার্সনের দোকানের সামনে অতর্কিতভাবে এক বাঙ্গালী যুবক তাঁর ওপর আক্রমণ করল। মিঃ ডে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। এই ঘটনার পর যুবকটি পার্ক ষ্ট্রীটের মধ্যে ঢুকে পড়ে ছুটতে লাগল। একজন ট্যাক্সিচালক এই ঘটনা দেখে গাড়ীসহ যুবকটির পিছু ধাওয়া করে। যুবকটি হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিচালকের ওপর গুলী চালাল। গুলী লোকটার তলপেট ভেদ করল। পার্ক ষ্ট্রীটে কর্ণেল হ্যারল্ড ব্রাউনের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে সে দেখল, বাড়ীর সামনে একখানা মোটর দাঁড়িয়ে আছে। যুবকটি মোটরচালকের কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের দিকে গাড়ী চালাতে বলল। মোটরচালক অস্বীকৃত হলে সে তার ওপরও গুলী চালাল, তবে এক্ষেত্রে আঘাত তত মারাত্মক হল না।

ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে একজন দারোয়ান তাকে ধরবার চেষ্টা করলে তাকেও সে জখম করল।

এরপর যুবকটি ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট দিয়ে ছুটতে লাগল এবং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট ও রিপন ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে পৌঁছে একখানা অপেক্ষমান গাড়ীতে ওঠবার চেষ্টা করল। এই সময় এ, ডবলিউ অগ্ নামে এক ব্যক্তি তার হাতে রিভলভার দেখে তাকে ধরে ফেলে। তার আহ্বানে প্রহরারত কয়েকজন কনষ্টেবলও এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় এবং সকলে মিলে যুবকটিকে পরাভূত করে।

তার দেহ তল্লাসী করে একটা মজার অটোমেটিক পিস্তল, একটা পাঁচঘরা রিভলভার, অনেকগুলো তাজা কার্ত্তুজ এবং গোটা-কয়েক কার্ত্তুজের খোলও পাওয়া যায়।

সেদিন পর্য্যন্তও যুবকটির কোনও পরিচয় আবিষ্কৃত হয়নি, কারণ, ১৩ই জানুয়ারীর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করে লেখা হল: 'Apparently the accused belonged to the "Bhadrolog" class for when arrested he was wearing an expensive wristlet watch and talked in English.'

মিঃ ডে ১২ই জানুয়ারী বেলা সাড়ে-চারটায় হাসপাতালে মারা গেলেন। আহতদের মধ্যে আর দু'জনের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন দেখে একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করলেন।

কলিকাতার ইউরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ এই আক্রমণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় এম্পায়ার থিয়েটারে কলিকাতার ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অধিবাসীদের এক সভা বসল, সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ল্যাংফোর্ড জেমস। অনেক গরম গরম বক্তৃতার পর সভাপতি নিজে এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তারপর আর এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন বাঙ্গলার তৎকালীন আইনসভার সদস্য এডোয়ার্ড ভিলিয়ার্স। প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে বলা হল যে, তারা যেন কোনরকম আন্দোলনের কাছেই মাথা না নোয়ায়

এবং এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা তাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবে।

রক্সবার্গ তখন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৪ই তারিখে রক্সবার্গের এজলাসে ডে সাহেবকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা এবং তিনজন ভারতীয়কে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে এক মামলা উঠল। আসামীর কাঠগড়ায় যে যুবকটি দাঁড়ালেন তাঁর নাম গোপীনাথ সাহা। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গোপীনাথ এই চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিলেন:

'সাক্ষীরা যা বলেছে সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাইনা, কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটরের উক্তি সম্পর্কে আমার কিছু বলবার আছে। তিনি বলেছেন যে ইতিপূর্ব্বে আমাকে লালবাজারে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে এবং পুলিস আমাকে একদিন আর একজন লোকের সঙ্গে বৌবাজারের এক বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিল। এই কথা মোটেই ঠিক নয়। আমি সব সময়েই একা বেরুতুম বা ঘোরাফেরা করতুম, সব সময়েই আমার লক্ষ্য ছিল টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করা। আমি তাকে ভাল রকমেই চিনতুম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি একজন নিরপরাধ সাহেবকে হত্যা করেছি। এই নিরপরাধ সাহেবটি দেখতে অবিকল টেগার্টের মত। ঈশ্বরের কৃপায় টেগার্ট বেঁচে গেলেন, দুর্ভাগ্য এই যে, আমি আমার দেশের শত্রুকে মারতে পারলুম না। আমার ভুল হয়েছে বটে, কিন্তু এই দেশে যদি আর কোনও দেশপ্রেমিক যুবক থাকে তাহলে সে আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে। আশা করি, তার আর আমার মত

ভুল হবে না, আরও দক্ষতার সঙ্গে সে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করবে।’

গোপীনাথকে কপালে ব্যাণ্ডেজ-জড়ানো অবস্থায় আদালতে হাজির করা হল। সম্পূর্ণ শান্ত, অবিচলিতভাবে তিনি আদালতে বসে রইলেন, এমনকি, মাঝে মাঝে তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে আদালতের এই প্রহসনের দিকে তাঁর যেন বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য নেই। শুনানীর সময়ে টেগার্ট আদালতে হাজির ছিলেন। জবানবন্দীতে যখন গোপীনাথ বললেন যে, সব সময়েই আমার লক্ষ্য ছিল টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করা, তখন তিনি কঠোর দৃষ্টিতে টেগার্টের দিকে চেয়ে তারপর বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।

সরকার পক্ষে মামলার উদ্বোধন করলেন পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু। আসামী পক্ষে কেউই ছিল না। আসামী নিজেই মাঝে মাঝে জেরা করতে লাগলেন।

সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ হল। শ্রীরামপুরে গোপীনাথ যে বাড়ীতে থাকতেন, সেই বাড়ীতেই মণিমোহন দাস নামে আর একজন ভাড়াটে ছিল। মণিমোহন তার সাক্ষ্যে বলল যে, গোপীনাথ শ্রীরামপুরে ক্ষেত্রমোহন সাহা লেনে তাঁর ভাই শ্যামাচরণের সঙ্গে থাকতেন, তাঁর বাপের নাম বিজয়কৃষ্ণ সাহা। শ্যামাচরণরা চার ভাই, তাঁদের মা বেঁচে আছেন। চার বছর আগে গোপীনাথ শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন ইনষ্টিউটে পড়তেন, তাঁর পড়াশুনো দ্বিতীয় শ্রেণী (এখনকার নবম শ্রেণী) পর্য্যন্ত। শ্যামাচরণই গোপীনাথের ভরণপোষণ করে থাকেন।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ বেভিন তাঁর সাক্ষ্যে বললেন যে, শাঁখারীটোলা হত্যার সময়ে যে ধরণের পিস্তলের কার্ত্তুজ পাওয়া গেছল, গোপীনাথের কাছেও প্রায় সেই রকমেরই কার্ত্তুজ পাওয়া গেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট গোপীনাথকে দায়রায় সোপর্দ্দ করলেন। রায় শুনে গোপীনাথ বলে উঠলেন, 'বেশ, বেশ।'

১১ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের দায়রায় বিচারপতি পিয়ার্সনের এজলাসে গোপীনাথের মামলার শুনানী আরম্ভ হল।

নিম্ন আদালতে গোপীনাথের পক্ষ সমর্থনে কোনও আইনজীবী হাজির ছিলেন না। দায়রায় এইচ, এম, বসু, এন, এম, চাটার্জি ও এম, ব্যানার্জি আসামী পক্ষে দাঁড়ালেন। আসামী পক্ষ থেকে বলা হল যে, গোপীনাথ সুস্থমস্তিষ্ক নয়, কাজেই এ অবস্থায় তাঁর বিচার চলতে পারে না।

বিচারপতি আটজন ভারতীয় ও একজন ইউরোপীয় নিয়ে জুরী গঠন করলেন। আসামী পক্ষ থেকে যে আপত্তি তোলা হয়েছে তার যথার্থ্য নির্দ্ধারণের জন্য জুরীদের ওপর ভার দেওয়া হল। জুরীরা গোপীনাথকে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পর, পরদিন একযোগে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, আসামী সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্ক এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সামর্থ্য তাঁর আছে। এর পর আবার শুনানী আরম্ভ হল।

অভিযোগ পড়ে শোনাবার পর গোপীনাথ বললেন যে, তিনি নিরপরাধ। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হলে

গোপীনাথ আদালতে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন তাতে তিনি বললেন :

'লালবাজারে কিংস পুলিস মেডেল বিতরণের দিন আমি টেগার্ট সাহেবকে প্রথম দেখলুম। নিউ মার্কেটে ফুলের দোকান-গুলোর কাছে আমি তাঁকে বহুবার দেখেছি, আমি বহুবার তাঁর পাশ দিয়ে গেছি। যখন তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন তখন আমি বহুবার আগ্নেয়াস্ত্রসহ তাঁর পেছু পেছু ইডেন গার্ডেন ও অন্য বহু জায়গায় গেছি। এমনকি, তাকে মারবার জন্য আমি একবার রিভলভারের ট্রিগারেও হাত দিয়েছি। কিন্তু সে সময়েও আমি গুলী করিনি, কারণ, তখন পর্য্যন্তও আমি মায়ের আদেশ পাইনি। ইতিপূর্ব্বে আমি এই চিন্তা নিয়ে যে মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটিয়েছি, এই ঘটনার দু'তিন দিন আগে আমার মনের ঠিক সেই অবস্থা ফিরে এল। আমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল, নিদ্রাহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আমি কাটাতে লাগলুম। ঘরের মধ্যে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি গড়ের মাঠে বেড়াতে গেলাম এবং অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে অনেক এগুলাম। তারপর আমার নজর পড়ল একজন সাহেবের ওপরে। মনে হল যেন সেই টেগার্ট। আমি তাঁকে গুলী করলুম।

'জেল থেকে আমি আমার মাকে একখানা চিঠি লিখতে চাই। রায় দেবার সময়ে এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে জেলে জীবন কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি যেতে চাই আমার মায়ের কাছে। আর কিছুই আমার বক্তব্য নেই।'

১৫ই ফেব্রুয়ারী আসামী পক্ষের কাউন্সেল সওয়াল জবাব করলেন। গোপীনাথকে যখন আসামীর কাঠগড়া থেকে পুলিস নামিয়ে নিয়ে গেল তখন তিনি বাঙ্গলায় চেঁচিয়ে বললেন ঃ

'মিঃ টেগার্ট মনে করতে পারেন যে তিনি নিরাপদ, কিন্তু সত্যিই তিনি নিরাপদ নন। আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয়েছি বটে, কিন্তু আমার অসমাপ্ত কার্য্যভার আমি আমার দেশবাসীর ওপর দিয়ে যাচ্ছি।'

১৬ই তারিখে জুরীরা তাঁদের অভিমত প্রকাশ করলেন, মিঃ ডে-র প্রতি গুলীবর্ষণ ও তাঁকে হত্যার জন্য তাঁরা গোপীনাথকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে দোষী সাব্যস্ত করলেন। জজ জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে গোপীনাথকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। কাঠগড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার কালে গোপীনাথ চেঁচিয়ে বললেন ঃ

'আমার দেহ-শোণিতের প্রতিটি বিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করুক।'

১লা মার্চ্চ প্রেসিডেন্সী জেলে গোপীনাথের ফাঁসি হয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর অবিচলিতচিত্তে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করলেন।

ইতিপূর্ব্বে, ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মদনমোহন সাহা জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং চীফ সেক্রেটারীর নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করেন যে, হিন্দু প্রথামতে সৎকারের জন্য গোপীনাথের শব নিয়ে যাওয়ার অনুমতি যেন তাদের দেওয়া হয়। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন এবং নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের মারফৎ অনুমতি মিলল বটে,

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট জানিয়ে দিলেন যে, শব বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, গোপীনাথের চারজন আত্মীয় গিয়ে জেলের মধ্যে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে পারবেন।

ফাঁসি হয়ে যাওয়ার অনেক পরে, বেলা আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় গোপীনাথের আত্মীয়দের জেলে ঢুকতে দেওয়া হল। বেলা ন'টার সময়ে নারী কয়েদীদের ওয়ার্ডের কাছে বহির্দ্দেওয়ালের পাশে গোপীনাথের শব চিতার ওপর তোলা হল। হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী মৃতের নাভিমণ্ডলের দগ্ধাবশেষ গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয় এবং অস্থি গয়ায় পিণ্ডদানের জন্য রাখা হয়। কিন্তু গোপীনাথের নাভি বা অস্থি নেওয়ার অনুমতি আত্মীয়রা পেল না।

কর্ত্তৃপক্ষ জেলের মধ্যে গোপীনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের অনুমতি দিয়েছে শুনে সুভাষচন্দ্র, পূর্ণ দাস এবং বহু ছাত্র প্রেসিডেন্সী জেলে গেলেন। কিন্তু জেল ফটকে আসার পথে যে পাহারা বসানো হয়েছিল তারা তাঁদের এগুতে দিল না। ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁরা ফিরে এলেন।

ফাঁসির হুকুম হওয়ার পর কানাইলালের মত গোপীনাথের ওজনও পাঁচ পাউণ্ড বেড়ে গিয়েছিল। রাত্রে তাঁর নিদ্রা হত খুব গভীর, আহার করতেন নিয়মিত সময়ে, সেই হাস্যময় মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্রও ছিলনা।

সে যুগের ইউরোপীয় সমাজে ডে-হত্যা যে আলোড়ন তুলেছিল, লণ্ডন পর্য্যন্ত তার প্রতিক্রিয়া পৌঁছেছিল। ওয়ার্ড্‌ল মিল্‌নে নামক একজন সদস্য বিজ্ঞতার ভাণ করে কমন্স সভায়

এই রকম সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, অহিংস অসহযোগীদের সম্ভবতঃ এই হত্যার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সরকার পক্ষে অধ্যাপক রিচার্ডস বললেন যে, ডে-র হত্যাকারী একটা গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য। অহিংস অসহযোগীরা জাতি-বিদ্বেষের পোষক হলেও, এ রকম মনে করার কোনও যুক্তি নেই যে, তারা তাদের নীতি হিসাবে এই হত্যায় প্ররোচনা জুগিয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে, বিপ্লবীদলের সঙ্গে গোপীনাথের যোগাযোগ সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। গোপীনাথের মামলায় সাক্ষ্যের কালে ডেপুটি কমিশনার মিঃ বেভিন বলেছিলেন যে, শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিস হানায় যে রকম কার্তুজ পাওয়া গেছল গোপীনাথের কাছেও অনুরূপ কার্তুজ পাওয়া গেছে। আসলেও, শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে হানা এবং ডে-হত্যা একই দলভুক্ত বিপ্লবীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই দলের নেতা ছিলেন সন্তোষ মিত্র, যিনি ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দিশালায় পুলিসের গুলীতে প্রাণ দেন। অনন্ত সিং প্রভৃতি চট্টগ্রামের বিপ্লবীদেরও এই দলের সঙ্গে সংযোগ ছিল।

গোপীনাথের কাজকে নৈতিকভাবে সমর্থনের প্রশ্ন নিয়ে সে সময়ে বাঙ্গলার কংগ্রেস দলের মধ্যেও যথেষ্ট মতদ্বৈধ দেখা দেয়। সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে তরুণ নেতৃবৃন্দ গোপীনাথের প্রশংসাসূচক একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। কিন্তু পরে গান্ধীজী ঐ প্রস্তাবের নিন্দা করে এক প্রবন্ধ লেখায়, পর বৎসর ফরিদপুর সম্মেলনে সিরাজগঞ্জ

সম্মেলনের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়া হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনেও গোপীনাথের প্রশংসাত্মক এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অধিবেশনে গান্ধীজীর উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রস্তাবের পক্ষে অনেক ভোট পড়েছিল। গোপীনাথের দেশপ্রেম অহিংসাপন্থী কংগ্রেসসেবীদের মনেও যে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মরণজয়ী বীর

বেত মেরে কি মা ভোলাবে

আমি কি মার সেই ছেলে
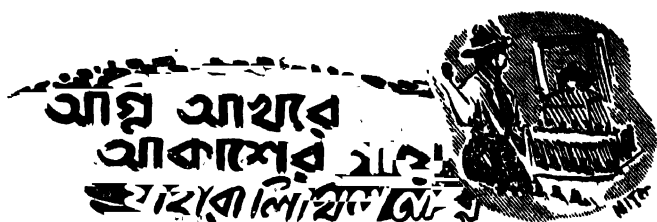
ভারতের বিপ্লবাধ্যায়ে ভগৎ সিংএর আবির্ভাব ও বিদায় এক ঝলক বিদ্যুতের মত। নৈরাশ্যের অন্ধকারে জাতি যখন দৃষ্টিহীন, বিমূঢ়, তখন তিনি নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে তাদের চোখের সামনে পথকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে তাঁর সেই আত্মদান বৃথা যায় নি, জাতি তারি মধ্য থেকে ত্যাগের পথে অভিসারের নূতন সঙ্কেত নিলো। ভগৎ সিংএর সমাধি-শিয়রে দাঁড়িয়ে তারা ধ্বনি তুলল, 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ'—ইংরাজের চোখে তাঁর মৃত্যু হলেও জাতির মনোরাজ্যে তিনি পেলেন চির-অমরত্ব।

১৯২৯ সালের প্রথমার্দ্ধে একদিন কেন্দ্রীয় পরিষদে একটা বোমা ফাটল। এর কয়েকদিন আগে গবর্ণমেণ্ট পরিষদে বাণিজ্য-বিরোধ বিল নামে শ্রমিকদের স্বার্থহানিকর এক বিল পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত সেখানে ধরা পড়লেন। ধরা পড়ে ভগৎ সিং আদালতে

ওজস্বিনী ভাষায় এক বিবৃতি দিলেন। সেইদিনই দেশবাসী তাঁকে চিনল।

কিন্তু ভগৎ সিংএর পরিবারকে দেশবাসী তারও বহু আগে চেনবার সুযোগ পেয়েছিল। ভগৎ সিংএর খুল্লতাত সর্দ্দার অজিত সিং পাঞ্জাবের ক্যানাল কলোনি আন্দোলনের যুগের একজন নামজাদা বিপ্লবী। ১৯০৭ সালে এই প্রজাস্বার্থ-বিরোধী বিলের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়, তার কণ্ঠরোধের জন্য গবর্ণমেণ্ট লালা লজপত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংকে দেশান্তরিত করেন। কিন্তু সর্দ্দারজী কিছুদিনের মধ্যেই নির্ব্বাসন-স্থান থেকে পারস্যে পলায়ন করেন এবং সেখান থেকে জার্ম্মানীতে যান। পরবর্ত্তীকালে তিনি বিদেশে থেকে ভারতে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য বহু ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

ভগৎ সিংএর পিতার নাম কিষেণ সিং। ভগৎ সিংএর বয়স যখন ষোল কি সতের তখন থেকেই তাঁর মনে কর্ম্মের উন্মাদনা এসেছে, বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি রীতিমতভাবে মেলামেশা আরম্ভ করেছেন। গদর বিপ্লবের অন্যতম নায়ক শহীদ কর্ত্তার সিংএর জীবনই তাঁকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৯২৫ সালে গবর্ণমেণ্ট কাকোরী ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে বেপরোয়া ধরপাকড় আরম্ভ করলেন। শচীন সান্যাল, যোগেশ চাটার্জি প্রমুখ নেতারা ধরা পড়লেন, পুলিস এক বিরাট মামলা ফেঁদে বসল।

দেশের যুবকদের মধ্যে তখন দেখা দিয়েছে তীব্র এক ব্যর্থতাবোধ ও নিষ্ক্রিয়তা। ১৯২০-২১ সালের গণ-আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে ; কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত, একদল কাউন্সিলে প্রবেশের সমর্থক, আর একদল চায় তার বর্জ্জন। স্বরাজ্য পার্টির কাজ যা কিছু কাউন্সিলের মধ্যেই, বাইরে তার কোনও কার্য্যকলাপ নেই। গণ-আন্দোলনের এই ব্যর্থতাই লোকচক্ষের অন্তরালে তরুণ-মনকে সন্ত্রাসবাদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্ম্মীরা তখন পাঞ্জাবে নওজোয়ান সভা গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠনই ছিল এই দলের উদ্দেশ্য। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই পাঞ্জাবে এই প্রতিষ্ঠান খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সন্ত্রাসবাদী দলের জন্য কর্ম্মী সংগ্রহের কাজও তখন এই সমিতির মারফৎই চলছিল।

কিছুদিনের মধ্যে আর একজন প্রতিভাশালী বিপ্লবীও ভগৎ সিংএর সঙ্গে জুটলেন। এঁর নাম চন্দ্রশেখর আজাদ। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রশেখরকেই তখন পর্য্যন্ত পুলিস ধরতে পারেনি।

এই সময় থেকেই ভগৎ সিংএর দলের নাম বদলাল, কর্ম্মসূচী ও সংগঠন-ব্যবস্থারও ঘটল পরিবর্ত্তন। ভগৎ সিংএর বিপ্লবী সমিতির নূতন নাম হল হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন, ভারতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হল এর লক্ষ্য। একটা কেন্দ্রীয় সমিতি এবং তার অধীনে প্রাদেশিক ও জিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে কাজ আরম্ভ হল। হিন্দুস্থান

রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের সঙ্গে তখনকার কম্যুনিষ্ট নেতাদেরও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এমনকি, এক সময়ে দুটো দলের একত্র হয়ে কাজ করবারও কথা হয়েছিল। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা গুপ্ত সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে গণ-আন্দোলনের পরিপন্থী মনে করায় রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের নায়করা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হলেন।

১৯২৮ সালে এল সাইমন কমিশন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট, বিক্ষোভ। বোম্বাইএর শ্রমিকরা একদিন ধর্ম্মঘট করে কমিশন নিয়োগের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানাল। কমিশন যেখানে গেল, সেখানেই পেল বিরূপ সম্বর্দ্ধনা—'সাইমন ফিরে যাও।'

গবর্ণমেন্ট ক্ষেপে উঠল। দেশবাসীর কণ্ঠরোধের জন্য তারা ব্যাপক দমন-নীতির সূচনা করল। লাহোরে এক বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুলিস লাঠি চালাল। মিছিলের নেতা লালা লজপত রায় আহত হলেন। এই আঘাতের পরিণতিতেই দেশপূজ্য লালাজী কয়েক দিনের মধ্যে পরলোক গমন করলেন।

সমগ্র দেশ ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল! ব্যর্থ আক্রোশে গণ-চিত্ত আর্ত্তনাদ করতে লাগল। ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্ম্মীরা বুঝলেন যে আঘাত হানার সময় এসেছে। লালাজীর মিছিলের ওপর লাঠি চালানর হুকুম দিয়েছিলেন লাহোরের সহকারী পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সণ্ডার্স। কিছুদিনের মধ্যেই সণ্ডার্স কোতোয়ালীর সামনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক আকাশে তখন আসন্ন ঝড়ের ছায়া পড়েছে। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, এক বছরের মধ্যে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস না পেলে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবে।

এই সময়ে শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্ট নেতাদেরও ব্যাপকভাবে ধরপাকড় আরম্ভ করলেন, কেন্দ্রীয় পরিষদে বাণিজ্য-বিরোধ আইন নামে এক শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হল।

ভগৎ সিং দ্বিতীয় আঘাত হানলেন। ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন চলার কালে দর্শকদের আসন থেকে একটা বোমা সভাস্থলে নিক্ষিপ্ত হল। বোমাটা মারাত্মক নয় বলে বিশেষ কোনও ক্ষতি হল না, কয়েকজন মাত্র সামান্য রকম আহত হল।

এই ঘটনা সম্পর্কে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ধরা পড়লেন। আদালতে তাঁরা দুজনে ওজস্বিনী ভাষায় এক বিবৃতি দিয়ে জানালেন, কেন তারা এ কাজ করেছেন। বিবৃতিতে তাঁরা বললেন—

'আমরা বিশেষ মনোনিবেশের সঙ্গে আমাদের দেশের ইতিহাস, দেশের লোকের অবস্থা ও আশা আকাঙ্ক্ষা পর্য্যালোচনা করে দেখেছি। কপটতাকে আমরা ঘৃণা করি। যে প্রতিষ্ঠান সূচনা থেকে ভাল কাজে শুধু অক্ষমতাই দেখায় নি, পরন্তু অনিষ্ট সাধনেরও অশেষ ক্ষমতা দেখিয়েছে, আমরা সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কল্পেই এই কাজ করেছি।......

'ভারতের ঘর্ম্মাক্ত শ্রমিকদের বহু কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ দিয়ে এই যে এক জমকালো প্রাসাদ গড়ে তোলা হয়েছে, বহু চেষ্টা করেও আমরা সেই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। এই প্রতিষ্ঠান একটা ফাঁকিবাজি মাত্র।...... গবর্ণমেণ্টের আইনসচিব মিঃ এস, আর, দাশ স্বীয় পুত্রকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, ইংলণ্ডের স্বপ্ন ভাঙ্গতে হলে বোমার দরকার। সেই কথা স্মরণ করেই আমরা পরিষদ-গৃহে বোমা ফেলেছি।'

বিচারে দু'জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল।

পরিষদে বোমা বিস্ফোরণের দু'দিন পরেই—১০ই এপ্রিল লাহোরে এক বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হল। শুকদেব, কিশোরী-লাল প্রভৃতি কয়েকজন সেখানে ধরা পড়লেন। জয়গোপাল নামে একজন কর্ম্মী ধরা পড়ে সব কথা ফাঁস করে দিল। হংসরাজ ভোরা নামে আর একজন কর্ম্মীও সেই পন্থাই অনুসরণ করল। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের অধিকাংশ নেতা ও কর্ম্মী গ্রেপ্তার হলেন। গবর্ণমেণ্ট লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে বিরাট এক মামলা খাড়া করল, ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বরকে আবার নূতন করে এই মামলায়ও আসামী করা হল। শুকদেব, কিশোরীলাল, সাহু বর্ম্মা, গয়াপ্রসাদ, জয়দেব, যতীন দাস, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, কমলনাথ ত্রিবেদী, যতীন সান্যাল, আজ্ঞারাম, দেশরাজ, প্রেমদত্ত, সুরেন্দ্রনাথ পাঁড়ে, মহাবীর সিং ও অজয় ঘোষ এই ষোলজনকে আসামী করে মামলা সুরু হল। পরে বিজয় সিং ও রাজগুরুও ধরা পড়লেন।

ভগবান দাস আর সদাশিবকে ভূসাভাইতে গ্রেপ্তার করা হল।

জয়গোপাল, হংসরাজ, রামশরণ দাস (১৯১৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত), ললিত মুখার্জি, ব্রহ্ম দত্ত, ফণীন্দ্র ঘোষ ও মনমোহন ব্যানার্জি এই সাতজন হল এই মামলায় রাজসাক্ষী।

সরকারপক্ষ থেকে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া হল এই যে, তাঁরা ১৯২৪ সাল থেকে ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য অর্থ, লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ের কাজে লিপ্ত ছিল এবং এতদুদ্দেশ্যে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন বা ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি নামে একটা সমিতি গঠন করে।

সরকারী বর্ণনা অনুযায়ী ষড়যন্ত্র ধরা পড়ল এইরূপে :—

লাহোরের রোশনী গেটের সামনে দশরার সময়ে যে বোমা ফাটে, তৎসম্বন্ধে তদন্তের কালে ওরিয়েণ্টাল কলেজের দু'জন প্রাক্তন ছাত্রকে রোশনী গেটের দ্বিতলে ও ত্রিতলের ওপর অবস্থিত বোর্ডিংএ যেতে দেখা যায়। তাদের একজনের কাছ থেকে জানা যায় যে, ভগৎ সিং মিঃ সণ্ডার্সের হত্যাকারীদের মধ্যে অন্যতম এবং ভগবতীচরণ পাঞ্জাবের বিপ্লবীদলের নেতা।

এর কিছুদিন পূর্ব্বে লাহোরে কয়েকজন লোহা ঢালাইকরকে কতকগুলো যন্ত্র তৈয়ারী করতে দেখা যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ঐগুলো গ্যাসের মেশিনের অংশ। যারা ঐসব যন্ত্র তৈয়ারীর ফরমাইস দিয়েছিল পুলিস তাদের পিছু নেয় এবং

ঐ বাড়ীর ওপরও কড়া নজর রাখা হয়। পুলিসের লোক শুকদেবের পশ্চাদনুসরণ ক'রে ৬৯নং কাশ্মীর বিল্ডিংএ যায়। গোপন তদন্তে জানা যায় যে, ভগবতীচরণ ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল। ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে খবর পাওয়া যায় ব্যবস্থা পরিষদে যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে সেগুলো ঠিক পূর্ব্বোক্ত গ্যাস মেশিনের অংশের ন্যায়। ঐ বাড়ীর উপর নজর রাখার পরিনতিতে ১৫-৪-২৯ তারিখে নানাস্থানে খানাতল্লাসী হয় এবং শুকদেব, জয়গোপাল ও কিশোরীলালকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯২৯ সালের জুলাই মাসে যখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হল, তখন ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদে জেলে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেছেন। ভগৎ সিং তখন খুব দুর্ব্বল, তাঁকে আদালতে আনা হত ষ্ট্রেচারে করে। সেখানে তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতেন।

মামলা চলতে থাকার কালে ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা আদালতে বসে পরামর্শ করে নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললেন। স্থির হল, সকল বন্দীই যোগ দেবেন প্রায়োপবেশনে, রাজবন্দীদের একই শ্রেণীতে থাকা এবং ভাল খাবার, সংবাদপত্র, বই এবং লেখার সরঞ্জাম পাওয়ার দাবীতে।

স্থুরু হল প্রায়োপবেশন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের এই বিখ্যাত প্রায়োপবেশনের পরিণতিতেই যতীন দাস আত্মোৎসর্গ করলেন।

প্রথমে গবর্ণমেণ্ট প্রায়োপবেশনকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। তাঁরা ভাবলেন, দু'দিনেই এই উত্তেজনা কেটে যাবে। দু'জন বন্দী ক'দিন পরেই অনশন ভঙ্গ করল। একে একে অনশনব্রতীরা সকলেই শয্যা নিল। কারা-কর্ত্তৃপক্ষ জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করে বিভ্রাট ঘটালেন। তেরদিনের দিন যতীন দাসের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠল। তাঁর দেহে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ঔষধ ও পথ্য দুইই খেতে অস্বীকার করলেন।

কারাজীবনের ক্লেশ ও বিজাতীয় শাসকদের ইঙ্গিতে পরিচালিত কারারক্ষীদের অকথ্য অত্যাচার আগে থাকতেই ভগৎ সিংএর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে দিয়েছিল। অনশনে তিনি আরও দুর্ব্বল ও ক্ষীণায়ু হয়ে পড়লেন। তবুও পরামর্শের অজুহাতে তিনি মাঝে মাঝেই অনশনব্রতী সহযোগীদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, সকলকে সাহস ও উৎসাহ দিতেন, যতীন দাসের শয্যাপার্শ্বে বসে থাকতেন।

শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের শুভবুদ্ধির উদয় হল, জেলের নিয়মকানুন বদলাবার জন্য গবর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতা হিসেবে এমন একটা কমিটি নিয়োগ করা হল, যার অধিকাংশই বেসরকারী লোক। কমিটির সদস্যরা জেলে এসে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করলেন, তাদের অধিকাংশ দাবীই মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলেন। এই আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বন্দীরা প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত করলেন।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুশয্যায়। তাঁর জীবনদীপ

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত স্তিমিত জ্বলছে। তেষট্টি দিন অনশনের পর যতীন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন।

গবর্ণমেণ্ট কিন্তু তাঁদের কথা রাখলেন না, ফলে বন্দীরা আবার অনশন অবলম্বনে বাধ্য হলেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে গবর্ণমেণ্টকে এত নাকাল হতে হল যে শেষ পর্য্যন্ত তারা লোকচক্ষের অন্তরালে কাজ সারবার জন্য এক ফন্দী আঁটলেন। আদালতে ন'মাস ধরে বিচার চলবার পর হঠাৎ ১৯৩০ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা অর্ডিনান্স নামে এক জরুরী আইন জারী করা হল। এই আইনে আসামীদের বিচারের ব্যবস্থা হল স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের কাছে। অবস্থা বিশেষে, আসামী, উকীল বা আসামীপক্ষের সাক্ষী কাউকেই আদালতে হাজির হতে হবে না। ট্রাইব্যুনাল প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়ার ক্ষমতা পেল, অথচ, তার রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আপীল চলবে না।

মামলায় তখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তা থেকেও এই অর্ডিনান্স জারীর কারণ কিছুটা উপলব্ধি করা যেতে পারে। ভগৎ সিংএর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ছিল সণ্ডার্স হত্যা। হত্যার সময়ে পুলিসের সহকারী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ফার্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ভগৎ সিংকে সনাক্ত করতে পারলেন না। তীব্র গণ-আন্দোলনের ফলে সরকার পক্ষের কয়েকজন প্রধান সাক্ষীও আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বেঁকে দাঁড়ালো। অন্যান্য সাক্ষীদেরও লক্ষণ ভাল বলে মনে হল না। দু'জন রাজসাক্ষী তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করল।

পক্ষকাল ধরে ট্রাইব্যুনালের সামনে মামলা চলার পর পুলিশ ও বন্দীদের মধ্যে একদিন সংঘর্ষ ঘটল শ্লোগান দেওয়া নিয়ে। বন্দীরা শ্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনকুড়ি পুলিস বেটন নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বন্দীরা খালি হাতেই লড়াই করতে লাগলেন। কিন্তু নিরস্ত্র লড়াই সম্ভব নয়, জন-কয়েক ত সাংঘাতিক রকমে আহত হলেন। এই বর্ব্বরোচিত আক্রমণের পর ট্রাইব্যুনালের একমাত্র ভারতীয় সদস্য আগা হায়দর বন্দীদের ওপর বলপ্রয়োগের নিন্দা করে এক বিবৃতি দিলেন। গবর্ণমেণ্ট এর পরেই ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করলেন। সদস্যদের তালিকা থেকে আগা হায়দরের নাম বাদ পড়ল।

১৯৩০ সালে পাঁচ মাস ধরে এই বিচারের প্রহসন চলার পর বেরুল ট্রাইব্যুনালের রায়। ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের হল প্রাণদণ্ডাদেশ, সাত জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বাকী কয়েকজনের লম্বা মেয়াদের কারাদণ্ড।

তখন কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে এবং কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আপোষের জন্যও একটা আলোচনা চলছে। দেশের লোকের আশা ছিল যে, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যদি কংগ্রেসের আপোষ হয়ে যায়, তাহলে তার অন্যতম সর্ত্ত হিসেবে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা সবাই মুক্তি পাবে, অন্ততঃপক্ষে প্রাণদণ্ড কারুর হবে না।

১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ্চ গান্ধীজী ও বড়লাট আরুইনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল এক চুক্তি, যা ইতিহাসে গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট নামে খ্যাতি পেয়েছে। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই গান্ধীজী

দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে যে বিবৃতি দেন, তার মধ্যপথে একজন সাংবাদিক ভগৎ সিং সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, ভগৎ সিং ও অন্যান্য বন্দীদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করে তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হবে কি না। গান্ধীজী উত্তরে বললেন যে, এ প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। খবরের কাগজে যা বেরুচ্ছে, তা থেকেই সাংবাদিকেরা কি হবে না হবে বেশ আঁচ করে নিতে পারবেন। এর বেশী আমি কিছু বলতে চাই না।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন বিনামেঘে বাজ পড়ল। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে, করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়ে গেল। সমগ্র ভারতে এক মহা বিষাদের ছায়াপাত হল, সেই বিষণ্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। করাচী অধিবেশনের সেই বিষাদময় স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া বলেছেন, 'সে সময়ে গান্ধীর নাম যেমন ভারতের সকলের কাছে পরিচিত ও প্রিয় ছিল, ভগৎ সিংও যে ঠিক সেই পরিমাণই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিলেন, একথা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। গান্ধী প্রাণপণ চেষ্টা করেও এই তিনজন তরুণের জীবন রক্ষা করতে পারেন নি।' কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে জনগণের নিরুদ্ধ ক্ষোভ গান্ধীজীর মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। কংগ্রেসে যোগদানের জন্য গান্ধীজী ও সর্দ্দার বল্লভভাই যখন করাচীর বার মাইল দূরে ট্রেণ থেকে নামলেন, তখন একদল যুবক তাঁর বিরুদ্ধে কৃষ্ণপতাকা

নিয়ে বিক্ষোভ আরম্ভ করল। বিক্ষোভকারীরা কতকগুলো কাল ফুল নিয়ে এসেছিল। গান্ধীজী তাদের ডাকলেন, হাসি-মুখে তাদের হাত থেকে সেই কাল ফুল নিলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশনকালেও মণ্ডপের বাইরে তুমুল বিক্ষোভ চলতে লাগল। এই বিক্ষোভের মধ্যেই করাচী কংগ্রেসে ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্ম্মীদের প্রাণদণ্ড সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—

'এই কংগ্রেস হিংসাত্মক রাজনীতির সহিত কোনও সম্পর্ক না রাখলেও এবং উহা অনুমোদন না করলেও, পরলোকগত সর্দ্দার ভগৎ সিং, শ্রীযুক্ত রাজগুরু ও শ্রীযুক্ত শুকদেবের বীরত্ব ও ত্যাগের প্রশংসা করছে এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। কংগ্রেসের অভিমত এই যে, এইভাবে তিনজনের প্রাণদণ্ডবিধান উচ্ছৃঙ্খল প্রতিহিংসাপরায়ণতার পরিচায়ক এবং সমগ্র জাতি তাদের দণ্ডলাঘবের জন্য যে দাবী জানাচ্ছিল, এতদ্বারা তাকেই তাচ্ছিল্য করা হল। এই কংগ্রেসের আরও অভিমত এই যে, আমাদের উভয় জাতির মধ্যে যে সদিচ্ছার সৃষ্টি বর্ত্তমানে একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, গবর্ণমেণ্ট তার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নৈরাশ্যের দরুণ যারা হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের শান্তির পথে চলতে প্রবৃত্ত করার সুযোগও তাচ্ছিল্য করলেন।'

প্রস্তাবের প্রথমাংশে হিংসার নিন্দাত্মক যে অংশটুকু ছিল, তা তুলে দেবার জন্য তরুণ সদস্যদের পক্ষ থেকে একটা সংশোধন

প্রস্তাব আনা হল। কংগ্রেসে অবশ্য মূল প্রস্তাবটিই গৃহীত হল, কিন্তু এই অংশটুকু নিয়ে পরে বহু বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনে এই অংশ বাদ দিয়েই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে বহু প্রাদেশিক সম্মেলনেও ঐ অংশ বাদ দেওয়ার প্রশ্ন নিয়ে বিতণ্ডা দেখা দেয়।

তখনকার দিনে যে সব সভা হত, তাতে আকাশ-বাতাস ছাপিয়ে সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠত, 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ।' ভগৎ সিংএর নাম তখন লোকের মুখে মুখে ফিরত, তার ছবি দেখা যেত ঘরে ঘরে। পট্টভি ঠিকই বলেছেন যে সেকালে ভগৎ সিংএর খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা গান্ধীজীর চেয়ে কম ছিল না।

আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ !

যতীন্দ্রনাথের দেহাবশেষ যেদিন কেওড়াতলার মহাশ্মশানে ভস্মরাশিতে বিলীন হল, সেদিন শোকার্ত্ত দেশবাসী অশ্রুসিক্ত চোখে সমাধিক্ষেত্রের দ্বারদেশে লিখে রেখেছিল 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।' মুক্তির পথ কৃচ্ছ্রসাধনের পথ। গণ-আন্দোলনের ব্যর্থতায় দেশ যখন নৈরাশ্যের অন্ধকারে দিশাহারা, পর-শাসনের গ্লানিতে বিদ্বিষ্ট মন যখন নিস্ফল ক্ষোভে আর্ত্তনাদ করছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেশবাসীর সামনে কর্ম্ম ও ত্যাগের নূতন আদর্শ তুলে ধরবার জন্য ডাক পড়েছিল নূতন যুগের দধিচীদের। দুঃখ ও দুঃসাহসের পথে সুরু হল অভিসার।

অসহযোগ আন্দোলনোত্তর যুগের এই ধারায় প্রথম এলেন গোপীনাথ, তারপর যতীন দাস, ভগৎ সিং। যতীন দাসের আগে আইরিশ বিপ্লবী টেরেন্স ম্যাক্সুইনি কারা-কর্ত্তৃপক্ষের অনাচারের প্রতিবাদে অনশনে প্রথম জীবন দেন। যতীন্দ্রনাথও

বিপ্লবীর সেই বজ্রকঠিন মনোবল 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনে'র আদর্শে ই গড়ে উঠেছিলেন। সে আদর্শ ক্ষণিকের উন্মাদনায় কাউকে মেরে মরার দুঃসাহস নয়। পাশবশক্তি-গর্ব্বী স্বৈর-শাসকের নির্লজ্জ অনাচারের নিকটে আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত হয়ে মানুষ যখন স্থিরসমাহিতচিত্তে মৃত্যুকেই মর্য্যাদার পথ বলে বেছে নেয়, আত্মার প্রেরণার কাছে রক্ত-মাংসের দেহের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে পলে পলে অস্বীকার করে' দেহের পরাজয় যে মনের পরাজয় নয়, অত্যাচারীর রক্ত-চক্ষুর সামনে সন্দেহাতীতভাবে তা-ই প্রমাণ করে, তখনই অনাগত ভবিষ্যতের বুকে তার জয়ের রেখা পড়ে। ম্যাক্‌সুইনির মৃত্যু যেমন আইরিশ জাতির স্বাধীনতা এনেছিল, যতীন দাসের আত্মদানও তেমনি ভারতকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

বাঙ্গলা যখন ভারতের কাণে নব-সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনাতে আরম্ভ করেছে—ঠিক সেই সময়ে, ১৯০৪ সালে যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম বঙ্কিমবিহারী দাস। পিতামহ মহেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন মুন্‌সেফ।

১৯২০ সালে যতীন্দ্রনাথ যখন ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তখন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনকে পুরোভাগে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যতীন্দ্রনাথ কলেজে ঢুকেছিলেন, কিন্তু দেশসেবার আগ্রহ তাঁকে অসহযোগের পথে টেনে আনল, দক্ষিণ কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতির অধীনে

তিনি কাজ করতে লাগলেন। ১৯২১ সালে পশ্চিম বঙ্গে বন্যা হলে যতীন্দ্রনাথ আর্ত্তত্রাণে আত্মনিয়োগ করেন।

এর অব্যবহিত পরেই তিনি একই বৎসরের মধ্যে আইন অমান্যের দায়ে দু'বার গ্রেপ্তার হন, প্রথমবার তাঁকে মাত্র চারদিন হাজতে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাঁর একমাস কারাদণ্ড হয়। ১৯২২ সালে তিনি বড়বাজারে পিকেটিং করে আবার ধরা পড়েন। এইবার তাঁর তিনমাস কারাদণ্ড হয়।

জেল থেকে যতীন্দ্রনাথ যখন বেরুলেন তখন অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটা দেখা দিয়েছে। এবার তিনি আশুতোষ কলেজে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশুনায় মন দিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসরই দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয় যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা।

১৯২৩ সালে শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিস লুটের চেষ্টা এবং ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে টেগার্টভ্রমে ডে-হত্যা সংঘটিত হয়। এই সময়কার আর তিনটে ঘটনা হচ্ছে চট্টগ্রামে ডাকাতি এবং কলিকাতা ও ফরিদপুরে বোমার কারখানা আবিষ্কার।

বাঙ্গলায় বিপ্লববাদের পুনরায় আত্মপ্রকাশে শঙ্কিত হয়ে গবর্ণমেণ্ট আবার আত্মরক্ষার বর্ম্ম এঁটে কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দিল। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জ্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, উপেন্দ্র-

-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, পূর্ণ দাস, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, সতীশ পাকড়াশী প্রভৃতিকে তিন আইনে আটক করা হয়। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর এক অর্ডিনান্স জারী করে তেষট্টি জনকে অন্তরীণ করা হল। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং অনিলবরণ রায়কেও তিন আইনে আটক করা হয়। ৫ই নভেম্বর গভীর রাত্রে যতীন্দ্রনাথকেও পুলিস গ্রেপ্তার করল। প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে রেখে পরে তাঁকে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। মেদিনীপুর জেলে পীড়িত হয়ে পড়লে সেখান থেকে তাঁকে ঢাকা জেলে আনা হল।

যে অনমনীয় মনোবল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথকে অমর করে রেখেছে, ঢাকা জেলেই তার প্রথম পরীক্ষা হয়। এখানে জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে যতীন্দ্রনাথ কুড়ি দিন অনশন করেন। ফলে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এর পরেই তাঁকে পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালী জেলে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে বাঙ্গলায় ফিরিয়ে এনে চট্টগ্রাম জেলার কোনও এক গ্রামেও তাঁকে কিছুদিন অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯২৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তি পান।

জেল থেকে বেরিয়ে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতায়

কংগ্রেসের অধিবেশন হলে তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন।

ভগৎ সিং কলিকাতা কংগ্রেসে যোগদানের জন্য এসেছিলেন এবং তখন যতীন দাসের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে বাঙ্গলা ও উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে নূতন উদ্যমে কাজে নামার জন্য বড় রকমের তোড়জোড় সুরু হয়েছিল। ১৯২৯ সালে রংপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনের কালে নিরঞ্জন সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, যতীন দাস, বিনয় রায় ও সতীশ পাকড়াশী সম্মিলিত হয়ে বিপ্লবীদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তখন বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে চলছে দলাদলির যুগ—কংগ্রেসে দলাদলি, বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ, ছাত্র-আন্দোলনে, শ্রমিক আন্দোলনেও আত্মবিরোধ। এদিকে, বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও তখন অনেকটা নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঝুঁকেছেন। এরই বিরুদ্ধে বাঙ্গলার তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে একটা 'রিভোল্ট-গ্রুপ' এই সময়ে গড়ে উঠল, যারা বৈপ্লবিক আদর্শ নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে চায়।

রংপুরের গোপন বৈঠকে বিপ্লবীদের কর্ম্মপন্থা মোটামুটিভাবে স্থির হল। বাঙ্গলার তিনটি জেলায় অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং ঢাকা ও কলিকাতায় একই সময়ে ছোট ছোট ঘাঁটি আক্রমণ ও অধিকার—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার সিদ্ধান্ত হল। চট্টগ্রামের অভ্যুত্থান এই পরিকল্পনারই একটি অংশ।

বিপ্লবীদের এই নূতন প্রস্তুতিতে যতীন দাসের ওপর ভার পড়ল মজার পিস্তল ও রিভলভার সংগ্রহ এবং উত্তর ভারতের

বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার। উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের বোমা তৈরী শেখাবার ভার নিয়ে যতীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবেও যান।

এদিকে পাঞ্জাবের আকাশ তখন ধীরে ধীরে ধূমায়িত হয়ে উঠছে। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে লাহোরের সহকারী পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সণ্ডার্স নিহত হন। তার আগে কাশীতে মিঃ ব্যানার্জি নামে এক গোয়েন্দাকে হত্যার চেষ্টা চলে এবং লাহোরের পাঞ্জাব ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়। ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বোমা ফাটলে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ধরা পড়েন। এর পরে বিহারে মৌলানিয়ায় এক ডাকাতি হয় এবং সাইমন কমিশনের সদস্যদের ট্রেণ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে।

এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গবর্ণমেণ্ট লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করে এবং ষোল জনকে গ্রেপ্তার করে। যতীন্দ্র-নাথ তাঁদের অন্যতম।

ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর তার আগেই পরিষদে বোমা নিক্ষেপের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। ফের তাঁদের ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করা হল। জেল কর্তৃপক্ষের অনাচার ও অব্যবস্থার প্রতিবাদে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর প্রথমে অনশন আরম্ভ করলেন, তারপর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য বন্দীরাও তাতে যোগ দিলেন।

অনশন আরম্ভ করার কয়েকদিনের মধ্যেই যতীন দাসের শরীর সাংঘাতিক রকমে ভেঙ্গে পড়ল। ১৮ই জুলাই তারিখেই

তাঁর ভাই কিরণ দাস এই সম্পর্কে কারা-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সঙ্কল্পে অটল। অনশনের দশম দিনে জোর করে খাওয়ান আরম্ভ হল। ফলে যতীন্দ্রনাথের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। ২৪শে জুলাই লাহোরের 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় বলা হল যে, যতীন দাসের অবস্থা খারাপের দিকে গেছে। জোর করে খাওয়াবার ফলে তাঁর নাক দিয়ে রক্তস্রাব হচ্ছে। তাঁকে জেল হাসপাতালে রাখা হয়েছে। পরদিন মামলার শুনানীর সময়ে অন্যতম আসামী যতীন সান্যাল বললেন, 'জোর করে খাওয়াবার চেষ্টার ফলে যতীন্দ্রনাথের অবস্থা খারাপের দিকে গেছে। সে এখন মৃত্যুশয্যায়।'

এইদিন জোর করে নাকে নল দিয়ে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করলে যতীন্দ্রনাথ অজ্ঞান হয়ে যান। তখন ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। জ্ঞান হল, কিন্তু তাঁর দেহে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এই দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও ঔষধ বা পথ্য গ্রহণে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করলেন।

২৯শে জুলাই ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে গঠিত 'বন্দী সাহায্য সমিতি' যতীন্দ্রনাথকে বাইরের চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করানোর প্রস্তাব করলে জেল-কর্তৃপক্ষ তাতে অস্বীকৃত হলেন। ৩১শে জুলাই তাঁর অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। এই সময়ে তাঁর শরীরের ওজন একশো উনচল্লিশ পাউণ্ড থেকে একশো চোদ্দ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছে।

২রা আগষ্ট পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ জননায়ক ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব জেলে গিয়ে তাঁকে জল ও ঔষধ পান করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সঙ্কল্পে অটল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তখন কংগ্রেসের সভাপতি। সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে তিনি এই সময়ে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন।

৫ই আগষ্ট যতীন্দ্রনাথের নাড়ীর গতি পঞ্চাশেরও নীচে নেমে গেল। তখন তিনি বিছানায় স্থাণুর মত পড়ে আছেন, নড়বার সামর্থ্য নেই। পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ জননেতা লালা দূনীচাঁদ যতীন্দ্র-নাথের অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এক তার পাঠালেন।

৬ই আগষ্ট যতীন্দ্রনাথের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল, রাত্রি আটটা থেকে বারটা পর্য্যন্ত তিনি চেতনাহীন অবস্থায় কাটালেন। এই সময়ে পাঞ্জাব ও কেন্দ্রীয় সরকার বন্দীদের সম্পর্কে পর পর দু'টো ইস্তাহার প্রকাশ করেন, কিন্তু বন্দীদের দাবী পূরণ সম্পর্কে তাতে কিছুই বলা হল না।

১১ই আগষ্ট কলিকাতা ও বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে যতীন্দ্র-নাথের মুক্তি দাবীতে বহু জনসভার অনুষ্ঠান হল। ১৭ই আগষ্ট যতীন্দ্রনাথের অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ানয় জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর পিতাকে খবর দেন এবং ভাই কিরণ দাসকে দিবারাত্র তাঁর শয্যাপার্শ্বে অবস্থানের জন্য অনুরোধ জানান।

২২শে আগষ্ট থেকে তাঁর হৃদপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এবং মৃতপ্রায় অবস্থায় তাঁর দিন কাটতে থাকে। কিন্তু এই

অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায়ও তাঁকে জল বা ঔষধ পান করানোর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই ভাবে দীর্ঘদিন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে কাটিয়ে ১৩ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বেলা একটা পাঁচ মিনিটের সময়ে যতীন্দ্রনাথ বিদায় নেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে জেল-কর্তৃপক্ষ কিরণ দাসের হাতে যতীন্দ্রনাথের দেহাবশেষ সমর্পণ করল। তাঁর দেহ যখন জেলের বাইরে নিয়ে আসা হল তখন সেখানে জমে উঠেছে এক বিরাট জনতা। লাহোরের পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হ্যামিলটন হার্ডিং সেই জনতার সামনে টুপি খুলে যতীন্দ্রনাথের অমর আত্মাকে অভিবাদন জানালেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথ তাঁর দেহ কলিকাতায় নীত হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সেই ইচ্ছানুযায়ী শবযাত্রা চলল ষ্টেশনের দিকে, পাঞ্জাবের বিশিষ্ট নেতারা রইলেন মিছিলের পুরোভাগে। ডাঃ মহম্মদ আলম শবাধার চুম্বন করে বললেন, যতীনের মত পুণ্যাত্মাকে ধারণ করে শবাধার পবিত্র হয়েছে। ডাঃ গোপীচাঁদ বল্লেন, ম্যাকসুইনির মৃত্যুতে আয়র্ল্যাণ্ডে স্বাধীনতা এসেছে,—যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুও ভারতের স্বাধীনতা আনবে।

মোহনলাল গৌতম, বটুকেশ্বরের ভগ্নী প্রমীলা দেবী, মিসেস ভগবতীচরণ, শকুন্তলা দেবী প্রভৃতি যতীন্দ্রনাথের শব নিয়ে কলিকাতায় এলেন। পথে যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ষ্টেশনে এক বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। ট্রেণ থামলে পণ্ডিত জওহরলাল ও অন্যান্য মহিলারা শবাধারের কাছে গিয়ে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রনাথের শব নিয়ে লাহোর এক্সপ্রেস হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছুল। সেখান থেকে তাঁকে বিরাট শোভা-যাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হল হাওড়া টাউন হলে।

সুভাষচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি। ১৪ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি জনসাধারণকে ১৫ই সেপ্টেম্বর শোকদিবসরূপে উদ্‌যাপন করে কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখতে, উপবাস করতে এবং জুতা পরিধান না করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

পরদিন রাত তিনটার সময় থেকেই কলিকাতা ও হাওড়ার রাজপথ 'বন্দে মাতরম্', 'যতীন দাস কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। সকাল আটটায় টাউন হল থেকে বিরাট এক শোকযাত্রা বের হয়। শোকযাত্রা এত দীর্ঘ হয়েছিল যে কেওড়াতলায় পৌঁছুতে বেলা দু'টো বেজে যায়। বিপিনচন্দ্র পাল অসুস্থতা সত্ত্বেও এদিন শ্মশানঘাটে এসে অপেক্ষা করছিলেন।

শ্মশানে যতীন্দ্রনাথের শবদেহ একটি বেদীর ওপর রাখা হলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকরা তার প্রতি অভিবাদন জানাল। তারপর তাঁর দেহে অগ্নিসংযোগ করা হল। সেদিন হাজার হাজার লোক যতীন্দ্রনাথের চিতাভস্ম নিয়ে গৃহে ফিরে-ছিল। যতীন্দ্রনাথের বিদায়ের বেদনার সঙ্গে সেদিন তারা শ্মশান থেকে আর এক দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিয়ে ঘরে ফিরেছিল, যার অভিপ্রকাশ দেখি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণে, ঢাকা ও কলিকাতায় লোম্যান-হডসন-সিমসন হত্যায়, লবণ ও আইন অমান্য আন্দোলনে। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুবরণ আগত দিনের যোদ্ধাদের নূতন সঙ্কল্পে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।

সাইমন কমিশন আসার পর থেকেই ভারতের আকাশে মেঘ খুব ঘন হয়ে জমে উঠ্‌ছিল। কমিশন বর্জ্জনের ব্যাপারে ভারতের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এবং সর্ব্বশ্রেণীর জনমতের মধ্যে কোনও মতানৈক্য ছিল না, কাজেই, কমিশনের সদস্যরা যেখানেই গেলেন সেখানেই আকাশ-বাতাস ছাপিয়ে উঠল বিরূপ-সম্বর্দ্ধনার ধ্বনি। সাইমন কমিশনের নিয়োগ শাসক ও শাসিতের মধ্যে মনোমালিন্য আরও তীব্র করে তুলল।

এমনি আবহাওয়ার মধ্যেই ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। তারপর ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে সাম্রাজ্যবাদী স্পর্দ্ধার ওপর চরম আঘাত হানবার জন্য গান্ধীজী লবণ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দাবানলের মত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল।

১৭ই এপ্রিল চট্টগ্রাম জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির এক বৈঠকে স্থির হল যে ১৯শে এপ্রিল জিলা কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক সূর্য্য সেন এবং কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সদস্য নির্ম্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং প্রভৃতি আইন অমান্য করবেন।

কিন্তু তার আগেই চট্টগ্রাম আঘাত হানল; গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত পন্থানুসরণে নয়, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে। জিলা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি যখন ১৯শে তারিখের দিকে নিবদ্ধ, তখন ১৮ই তারিখে চট্টগ্রাম কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটল।

১৮ই এপ্রিল রাত্রি সোয়া-দশটা। চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগারের দরজায় একখানা ট্যাক্সি এসে থামল। ট্যাক্সি থেকে পদস্থ সেনানীর পোষাকে নেমে এলেন লোকনাথ বল। অস্ত্রাগারের বারান্দায় উঠতেই প্রহরী তাঁকে চ্যালেঞ্জ করল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে কণ্ঠ তার নীরব হল। গাড়ীর ভিতরে ছিলেন নির্ম্মল সেন, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, জীবন ঘোষাল, ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী। এ ছাড়া, আগে থাকতেই গেটের কাছে অপেক্ষা করছিলেন আরও ছ'জন বিপ্লবী। গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ শুনে অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত সার্জেণ্ট-মেজর ফারেল বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকে একটা গুলী বিঁধল। অবশিষ্ট প্রহরীরা ভয়ে পালিয়ে গেল। বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারের দরজা ভেঙ্গে ফেললেন এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গাড়ীতে তুলে পুলিস হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হলেন। অস্ত্রশস্ত্র যা সেখানে পড়ে রইল তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।

পুলিস হেডকোয়ার্টার ছিল একটা টিলার ওপর। ঠিক একই সময়ে পুলিস হেডকোয়ার্টারের সামনেও একখানা গাড়ী

থামল। এই ঘাঁটী দখলের ভার ছিল অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের ওপর। পাঁচজন সেনানীবেশী বিপ্লবী এবং জনকয়েক সৈনিক হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করলেন। একজন সান্ত্রী আহত হল, অবশিষ্ট যে সকল পুলিস ঘাঁটিতে ছিল তারা আকস্মিক আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য যে যেখানে পারল লুকাল।

টেলিগ্রাম ও টেলিফোন অফিস দখল করার ভার ছিল অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর ওপর। জনকয়েক সঙ্গী নিয়ে তিনি টেলিগ্রাফ অফিস দখল করে এক্সচেঞ্জ বোর্ড ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললেন।

১৮ই এপ্রিলের দু'তিন দিন আগেই জনকয়েক বিপ্লবী রেল লাইন নষ্ট করে চট্টগ্রামকে বিছিন্ন করে ফেলবার জন্য সহর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে তাঁরা ধুম ও লাঙ্গলকোটের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনকে দু' জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। একখানা মালগাড়ী চট্টগ্রামের দিকে আসবার সময়ে ভাঙ্গা লাইনে পড়ে উল্টে গেল। ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রেল লাইন আটকে রইল।

প্রথম আঘাত সাফল্যমণ্ডিত হবার পর বিপ্লবীরা ধ্বনি ও আলোক-সঙ্কেতে নিশানা দিতে লাগলেন। অন্য সমস্ত বিপ্লবীরা এসে পুলিস হেডকোয়ার্টারে জুটল। সেই রাত্রের জন্য হেড-কোয়ার্টারেই বিপ্লবীদের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হল। চট্টগ্রামের মাষ্টারদা সূর্য্য সেন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের সভাপতি মনোনীত হলেন।

রাত্রির প্রথম দিকটা বেশ নিঃশব্দেই কাটল। কিন্তু রাত্রি আন্দাজ দু'টোর সময়ে জলের কারখানার ওপর থেকে হেড-কোয়ার্টারের দিকে মেশিন গানের গুলী আসতে লাগল। বিপ্লবীরা দেখলেন যে, সরকারপক্ষ নবোদ্যমে আক্রমণ আরম্ভ করলে হেডকোয়ার্টার থেকে প্রতিরোধ করা সহজ হবে না। তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হেডকোয়ার্টার পরিত্যাগ করলেন এবং একদল জালালাবাদের পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। এই সময়ে হেডকোয়ার্টারে অগ্নি সংযোগ করতে গিয়ে হিমাংশু সেন নামে একজন বিপ্লবী সাংঘাতিকভাবে অগ্নিদগ্ধ হলেন। হিমাংশু পরদিন মারা গেলেন।

তিনদিন চট্টগ্রামের অবস্থা বেশ শান্তভাবেই কাটল, এই তিনদিন সহরের কর্ত্তৃত্ব প্রায় বিপ্লবীদের হাতেই রইল। চট্টগ্রামের ইউরোপীয়রা গিয়ে উপকূলবর্ত্তী একখানা জাহাজে আশ্রয় নিল।

২২শে এপ্রিল সরকারপক্ষের পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হল। সরকারী পুলিস ও সৈন্যেরা জালালাবাদ পাহাড়কে চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো। বিপ্লবীরা ওপর থেকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে লাগলেন। সরকার পক্ষের মেশিন গানের গুলীতে বিপ্লবীদের দলের নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা সেন, টেগরা (হরিগোপাল বল), প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, যতীন্দ্র দাস, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ, নির্ম্মল লালা. মতিলাল কানুনগো ও অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার জীবন দিলেন। কিন্তু তাদের রক্তদান জয় আনল। সন্ধ্যা সাতটার সময়ে

সরকারী সৈন্যেরা পিছু হটতে আরম্ভ করল। জালালাবাদের পাহাড়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক গৌরবময় নূতন ইতিহাস রচিত হল।

কিন্তু বিপ্লবীরা বুঝলেন যে, সরকারী সৈন্যদের শক্তি অপরিমিত, এইভাবে তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চালানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। অতঃপর গেরিলা রণ-কৌশল অনুসরণ করার সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হল। বিপ্লবীরা অতঃপর জালালাবাদের পাহাড় থেকে সমতলক্ষেত্রে নেমে এসে দলে দলে জিলার নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়লেন।

অনন্ত সিং ও তাঁর দলের লোকেরা এই সময়ে বহু চেষ্টা করেও মাষ্টারদা এবং তাঁর দলীয় লোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে না পেরে কলিকাতায় রওনা হন। পথে ফেণী ষ্টেশনে পুলিশ তাঁদের সন্দেহক্রমে আটক করলে একজন রক্ষীর ওপর গুলী চালিয়ে তাঁরা সরে পড়লেন।

এরপর পুলিস ও বিপ্লবীদের মধ্যে পর পর অনেকগুলো সংঘর্ষ ঘটে গেল। ৬ই মে নদীতীরস্থ সামরিক ঘাঁটী আক্রমণ করতে গিয়ে সশস্ত্র পুলিস ও বিপ্লবীদের মধ্যে এক লড়াই হল। মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায় ও রজত সেন এই সংঘর্ষে জীবন দিলেন, ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী পুলিসের হাতে ধরা পড়লেন।

এই সময়ে পুলিস চট্টগ্রামে যে ভয়াবহ অত্যাচার আরম্ভ করে তাতে জন-জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সূর্য্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, অনন্ত সিং, নির্ম্মল সেন, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল

প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা তখনও পলাতক। পুলিশ প্রথমে এঁদের মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা হিসেবে পুরস্কার ঘোষণা করল, পরে পুরস্কারের পরিমাণ বাড়িয়ে সূর্য্য সেনের জন্য দশ হাজার ও অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের জন্য ছ' হাজার করা হল। পুলিস এঁদের ধরার জন্য একদিকে যেমন চট্টগ্রাম জিলা তোলপাড় করছিল, তেমনি ধৃত বিপ্লবীদের ওপরও অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। পুলিসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কোন কোন দুর্ব্বলমনা বিপ্লবী স্বীকারোক্তি করছেন বলেও এই সময়ে একটা গুজব ছড়ায়। এই স্বীকারোক্তি বন্ধ করার জন্য ২৮শে জুন অনন্ত সিং কলিকাতায় স্বয়ং পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে হাজির হয়ে আত্ম-সমর্পণ করলেন।

১লা সেপ্টেম্বর বৃটিশ পুলিস ফরাসী চন্দননগরে গিয়ে একটা বাড়ী ঘেরাও করল। এখানে পুলিসের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হল, তাতে মাখন নিহত হলেন, লোকনাথ, আনন্দ ও গণেশ গ্রেপ্তার হলেন।

এর পরেই সৈন্যদের সঙ্গে বিপ্লবীদের আর এক দফায় সংঘর্ষ হল চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে। এখানে সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত ও অপূর্ব্ব সেন সাবিত্রী দেবী নামে এক বিধবার বাড়ীতে গোপনে অবস্থান করছিলেন। সৈন্যেরা বাড়ী ঘেরাও করলে নির্ম্মল ও অপূর্ব্ব লড়াইএ নিহত হলেন, সরকারপক্ষের ক্যাপটেন ষ্টিভেন্সকে প্রাণ দিতে হল। সূর্য্য সেন, কল্পনা ও প্রীতিলতা সৈন্যদের বেড়াজাল ভেদ করে পালালেন।

অস্ত্রাগার আক্রমণের পর থেকে পুলিস ইন্সপেক্টর আহসানউল্লা চট্টগ্রামবাসীদের উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিলেন। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে আহসানউল্লা খেলার মাঠে হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামে এক কিশোরের গুলীতে নিহত হলেন। হরিপদ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

১৯৩২ সালের ১লা মার্চ্চ চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের প্রথম মামলার যবনিকাপাত হল, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, লালমোহন সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী, আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন, সহায়রাম দাস, রণধীর দাশগুপ্ত, সুবোধ রায় ও সুখেন্দু দস্তিদার—এই বারজন বিপ্লবী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। অনিলবন্ধু দাস ও নন্দলাল সিংএর হল স্বল্প মেয়াদের কারাদণ্ড।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক অম্বিকা চক্রবর্ত্তীকে পুলিস ১৯৩০ সালের শেষভাগে গ্রেপ্তার করেছিল। অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, সরোজ গুহ এবং অপর একজনকে আসামী করে একটা অতিরিক্ত মামলা দায়ের করা হয়। অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রথমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, পরে দণ্ডাদেশ কমিয়ে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সরোজ গুহেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

কিন্তু মাষ্টারদা তখনও ধরা পড়েন নি। মাষ্টারদা স্থির করলেন যে, চট্টগ্রামের উপকণ্ঠস্থ পাহাড়তলীতে ইউরোপীয়দের ক্লাব আক্রমণ করতে হবে। এই আক্রমণের নেতৃত্ব-ভার পড়ল চট্টগ্রামের বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ওপরে।

এই আক্রমণে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী তেরজন সাংঘাতিক-ভাবে আহত হল, মিসেস স্থলিভান নাম্নী একজন মহিলা নিহত হলেন। প্রীতিলতা এই আক্রমণে সাংঘাতিক রকমে আহত হলে পথে পোটাসিয়াম সায়ানাইড নামক উগ্র বিষ সেবনে আত্মহত্যা করেন। তাঁর পকেটে যে বিবৃতি পাওয়া গেল তাতে লেখা ছিল যে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরদিন থেকে চট্টগ্রামে যে সব ব্যাপার ঘটেছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে, তা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারই অঙ্গ বলে গণ্য করতে হবে। ভারতবর্ষ যতদিন শৃঙ্খলিত থাকবে ততদিন এই সংগ্রামের কোনও বিরাম নেই। পাহাড়তলীর এই আক্রমণ সম্পর্কে সন্দেহক্রমে মোট চুরাশি জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু প্রমাণাভাবে পরে সকলকেই পুলিস ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

সূর্য্য সেন এযাবত খুব সাফল্যের সঙ্গেই পুলিসকে এড়িয়ে চলছিলেন, কিন্তু এইবার তাঁর মেয়াদও ফুরিয়ে এল। ১৯৩৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী—অভ্যুত্থানের প্রায় তিন বছর পরে পুলিস ও সশস্ত্র গুর্খারা চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত গৈরালা গ্রামে একটা বাড়ী ঘেরাও করল। সূর্য্য সেন ধরা পড়লেন। কল্পনা দত্ত, মণি দত্ত ও শান্তি চক্রবর্ত্তীও ঐ সময়ে এই বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কৌশলে পুলিসের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হলেন।

জুন মাসে তারকেশ্বরের সঙ্গে কল্পনা দত্তও ধরা পড়লেন। এঁদের বিচার হল একসঙ্গে। সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বরের

প্রাণদণ্ডের হুকুম হল। কল্পনা দত্তের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসি হয়ে গেল।

সূর্য্য সেন ধরা পড়ার পর চট্টগ্রামের তরুণরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মাষ্টারদার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। নেত্র সেন বলে যে লোকটি পুলিসকে সূর্য্য সেনের খবর যুগিয়েছিল, গৈরালয়ে তাকে হত্যা করা হল। ঐ দিনই হিমাংশু চক্রবর্ত্তী, নিত্য সেন, হরেন চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী ক্রিকেট খেলার মাঠে বোমা ফেলে ও রিভলভারের গুলী চালায়। হিমাংশু ও নিত্য ঘটনাস্থলেই মারা গেল। হরেন ও কৃষ্ণের ধরা পড়ে ফাঁসি হল।

এই দু'টো ঘটনা ঘটল সূর্য্য সেনের ফাঁসির ঠিক দশদিন আগে। সূর্য্য সেনের ফাঁসির পর চট্টগ্রামে বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপের পরিসমাপ্তি ঘটল।

ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্যে চট্টগ্রামই একমাত্র স্থান যেখানে বিপ্লবীরা তাঁদের পরিকল্পনা সময়-নির্ঘণ্ট অনুসারে কার্য্যকরী করে আঞ্চলিকভাবে পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করেছিলেন। এই বিপ্লবের মধ্যমণি সূর্য্য সেন আজ পৌরাণিক বীরের দ্যুতি নিয়ে তাঁর দেশবাসীর অন্তর্লোকে চিরজীবী হয়ে আছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে পুলিস তাঁর মাথার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, তবুও তিন বছর যাবত তিনি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে বিপ্লবাত্মক সংগঠন চালিয়ে যান। চট্টগ্রামের নিরক্ষর লোকদের ধারণা ছিল যে সূর্য্য সেন

মন্ত্র জানেন, হাওয়ার সঙ্গে তিনি মিশিয়ে থাকেন, তাই পুলিসে তাঁকে ধরতে পারে না। সূর্য্য সেনের নিরুদ্দেশ-জীবন যাপনের কালে চট্টগ্রামে তাঁর নামে অজস্র গল্প প্রচলিত ছিল। কেউ তাঁকে দেখেছে মালীর ছদ্মবেশে পুলিসের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যেতে, কেউ দেখেছে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে গ্রামের লোকদের সঙ্গে আলাপ করতে, কেউ দেখেছে ছদ্মবেশী মাষ্টারদাকে পুলিসের সঙ্গে আলাপ করতে করতে দীর্ঘ পল্লী-পথ অতিক্রম করতে।

সূর্য্য সেনকে ধরতে গিয়ে পুলিসকেও কম নাকাল হ'তে হয় নি। পুলিস হঠাৎ খবর পেল পটিয়া গ্রামে সূর্য্য সেন লুকিয়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাড়ীকে ঘেরাও করা হ'ল। সকালবেলা বাড়ীর মালিক যেমনি বেরুলেন, পুলিস জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম আপনার?'

উত্তর এল, 'সূর্য্য সেন।'

—'সূর্য্য সেন? কোন্ সূর্য্য সেন?'

'মাষ্টার সূর্য্য সেন।'

পুলিসের উল্লাস দেখে কে! ধরা হল সূর্য্য সেনকে। তারপর সহর থেকে এল গোয়েন্দা দপ্তরের লোকেরা সূর্য্য সেনের আলোকচিত্র নিয়ে। পুলিস আহম্মক সাজল। কাকে ধরতে কাকে তারা ধরেছে! যাকে ধরেছে তার নামও সূর্য্য সেন বটে, তবে তিনি স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার মাত্র, বিপ্লবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।

১৯১৮ সালে সূর্য্য সেন প্রথমে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন।

সূর্য্য সেনের বাড়ী ছিল চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাওজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে। উমাতারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘ দিন যাবত মাষ্টারী করেন। চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেও সূর্য্য সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী এবং নির্ম্মল সেনকে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে কিছুদিন জেলে কাটাতে হয়। শাঁখারীটোলা পোষ্ট আফিসে হানা ও ডে-হত্যার পর গবর্ণমেণ্ট যখন ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর এক অর্ডিনান্স জারী করে তেষট্টিজনকে অন্তরীণ করল তখন সেই দলের মধ্যে সূর্য্য সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষপ্রভৃতি চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা এবং নিরঞ্জন সেনও (পরবর্ত্তীকালে মেছুয়াবাজার বোমা মামলার আসামী) পড়েছিলেন। সূর্য্য সেন এই সময়ে প্রথমে মেদিনীপুর জেলে এবং পরে রত্নাগিরি ও বেলগাঁও জেলে আটক ছিলেন। এই সময়ে নিরঞ্জন সেনও তাঁর সঙ্গে রত্নগিরি ও বেলগাঁও জেলে আটক ছিলেন। ১৯২৮ সালে এঁদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হয়।

মাষ্টারদার আদর্শ ছিল আইরিশ বিপ্লবী ডান ব্রিন। ডান ব্রিনের My Right For Irish Freedom তিনি প্রত্যেক বিপ্লবীকেই পড়তে উপদেশ দিতেন। এমনকি, আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির নাম অনুসরণে তিনি নিজেদের দলের নাম রেখেছিলেন ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা। তিনি নিজে ছিলেন এর সভাপতি।

রাজনৈতিক ডাকাতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি বলতেন যে অর্থাগমের জন্য চিন্তা করতে হয় না। চট্টগ্রামের

অভ্যুত্থানের জন্য যে পনের হাজার টাকা দরকার হয়েছিল তা তিনি দলের মধ্য থেকে চাঁদা করে তুলেছিলেন।

সূর্য্য সেন সাংঘাতিক রকমের বিপদের সামনেও কখনও বিচলিত হতেন না। ১৯২৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে যখন বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হল, তখন এই সম্পর্কে পুলিস কলিকাতায় শোভাবাজারে এক তিনতলা বাড়ীতে হানা দেয়। সূর্য্য সেন তখন সেইখানেই ছিলেন। পুলিস আসছে শুনে তিনি মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেন, তারপর জামাটা খুলে রেখে কাঁধে একখানা গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দরজায় দু'জন পাহারাদার তাঁকে আটকালে তিনি সোজা বলে দিলেন, 'আমি চাকর, বাবুদের জন্য খাবার আনতে যাচ্ছি।' এর কিছু পরেই একজন আই-বি অফিসার ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেই খালি গায়ে লোকটি কোথায় গেল?' কিন্তু সূর্য্য সেন তখন হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেছেন।

সাধারণভাবে সূর্য্য সেন ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, মনের স্থৈর্য্য হারাতে তাকে খুব কদাচিৎই দেখা গেছে। কিন্তু এই শান্ত মানুষটিই যে প্রয়োজনক্ষেত্রে কিরকম বজ্রের মত কঠিন হতে পারতেন, তা না বললে তার চরিত্র-কথা অপূর্ণাঙ্গই থেকে যাবে। পূর্ব্বেই বলেছি যে নিরঞ্জন সেন দীর্ঘ দিন রত্নগিরি ও বেলগাঁও জেলে এই অসাধারণ মানুষটির সান্নিধ্যে ছিলেন। এই চার বছরের সান্নিধ্যে সূর্য্য সেন তাঁর মনে যে ছাপ অঙ্কিত করেছিলেন, 'বীর বিপ্লবী সূর্য্য সেন' নামে ক্ষুদ্র এক পুস্তিকায় তিনি তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ

করেছেন। শান্ত, নিরীহ সূর্য্য সেন যে প্রয়োজন হলে হঠাৎ কিরকম কঠিন হয়ে উঠতে পারতেন, তারই একটা ছবি এখানে নিরঞ্জন সেনের বই থেকে উদ্ধৃত করলুম। ব্যাপারটা ঘটেছিল মেদিনীপুর জেল থেকে বন্দীদের রত্নগিরি জেলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পথে :

নাগপুরে যখন আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়াবে তার আগেই একটা কাণ্ড ঘটল। আশুদা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তৎক্ষণাৎ সেপাইদের জানিয়ে দিলাম—আশুদা অসুস্থ, তাই নাগপুরে আমরা খানিকটা বিশ্রাম নেব। পাহারাদারদের বড় কর্ত্তা বেঁকে বসলেন, ঝাঁজের সঙ্গেই জানালেন—না, ওসব হবে না, নিয়ম নেই। আমরাও চড়া পরদায় জবাব দিলাম, ওসব নিয়মের বালাই আমাদের বেলায় নয়।

'কথা কাটাকাটিতে অবস্থা বেশ গরম হয়ে উঠল। আশুদার-দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি হাঁপাচ্ছেন, মাষ্টারদা, তাকে ধরে বসে আছেন। পুলিসগুলোর ওপর দারুণ রাগ হচ্ছিল। মানুষকে ডাণ্ডাবেড়ীতে বাঁধা এদের আটপৌরে অভ্যাস—নিয়মকেও তাই এরা লোহার শিকল বলেই জানে।

'ঘটনার গতি দেখে মনে হতে লাগল, আশুদাকে হয়ত নাগপুরে নামিয়ে কিছুটা বিশ্রাম করতে দিয়ে পরের গাড়ীতে নিয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের নাগপুরে অপেক্ষা করাবে না। আমরা যদি নাগপুরে থাকতে জোর করি, তবে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হতে পারে। এদিকে নাগপুর যে এসে পড়ল, অথচ নিজেদের ভিতর সে রকম কোন আলোচনাও হল না।

আশুদার কষ্ট দেখেই ঝোঁকের মাথায় সব বলা-কওয়া হয়ে গেছে।

'নাগপুরে গাড়ী এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই মাষ্টারদা আশুদাকে ধরে প্লাটফর্মে নামালেন। শুধু তা নয়, বেশ ঝাঁঝালো সুরে সেপাইদের হুকুম দিলেন আমাদের জিনিষ নামাতে। আবার এদিকে গোরা সার্জেণ্টদের দু'জন এসে মাষ্টারদাকে হুমকী দিল ; তাদের ভাবটা যেন এই—যে যার নিজের নিজের যায়গায় চলে যাও।......

'মাষ্টারদা একটুও হটলেন না, চেঁচিয়েই বললেন—তা হয় না, আমরা জেনে যেতে চাই আশুবাবুর জন্য কি ব্যবস্থা করা হল। সার্জেণ্টরা একথা শোনার পর গম্ভীরভাবে নিজেদের ভেতর পরামর্শ করতে লেগে গেল।

'ইতিমধ্যে প্লাটফর্মের অবস্থাও বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আশুদাকে ঘিরে আমরা তিনজন, আবার আমাদের ঘিরে সেপাইদের বেষ্টনী। ভীড় জমছিল, উত্তেজনা দারুণ বাড়তে লাগল। আমি ভাবছিলাম, কি যে হবে? হঠাৎ সেপাইদের বড়কর্ত্তা মাষ্টারদাকে ডেকে নিলেন। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। দু'এক মিনিট পরে আমাদের কাছে ফিরে এসে মাষ্টারদা জানালেন, সবশুদ্ধ পরের গাড়ীতে যাওয়াই ঠিক। আশুদাকে বিশ্রাম দিতে তারা রাজী।

সূর্য্য সেনের খ্যাতির সঙ্গে দেহের কোন সামঞ্জস্য ছিলনা বলে, পুলিসরা প্রায়ই ভুল করত। ঐরকম ছোটখাট মানুষ যে এরকম কাণ্ড ঘটাতে পারে, তা তাদের ধারণায়ই আসত না।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দু' বছরের মধ্যেও সূর্য্য সেনকে ধরতে না পেরে পুলিস অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল যে সূর্য্য সেন চট্টগ্রামে নেই। কিন্তু পাহাড়তলীর হানার পর তাদের ধারণা হল যে অদ্ভুতকর্ম্মা সূর্য্য সেন নিশ্চয়ই চট্টগ্রামে আছে। এই সময়ে সকলেই তাঁকে জেলা থেকে অন্যত্র যেতে বলেছিল। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না, বললেন, আমার এই লড়াইএর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিরোধের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা। শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্য জেলা ছাড়বার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাই না।

পলাতক-জীবনের শেষের দিকে তিনি যেন ভবিষ্যতের জন্য একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'মনে হয়, আমি যেন আজকাল একটু বেশী ঢিলে দিয়েছি।' তখন তিনি আর সেরকম সতর্কভাবে থাকতেন না, যে আসত তার সঙ্গেই দেখা করতেন। দলের মধ্যে মনোবল ও নিয়মানুবর্ত্তিতায়ও তখন যেন ভাঙ্গন ধরে এসেছে। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, 'এখন আমার কাল কেটে গেছে।' শেষের দিকে তিনি আত্মজীবনী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তা আর শেষ করতে পারেন নি। কাগজপত্র যা কিছু পাওয়া গেছল পুলিস তা নিয়ে যায়।

ধরা পড়ে সূর্য্য সেনের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে তাঁর ফাঁসি হবে। সেইজন্য তিনি তাঁর কার্য্যভার বুঝিয়ে দেবার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। মামলার শুনানীর কালে তিনি কাঠগড়ায় বসে তারকেশ্বরকে কাজ বুঝিয়ে দিতেন—তাঁর ধারণা

ছিল তারকেশ্বরের ফাঁসি হবে না। জেলেও তিনি তারকেশ্বরের সঙ্গে দেখা করে দীর্ঘ সময় যাবত আলোচনা করতেন। তখন তাঁদের ছু'জনেরই কুঠরীর দরজায় ছিল কড়া পাহারা। কিন্তু সূর্য্য সেন গুর্খাদের বশে এনে ফেলেছিলেন, রাত্রে তারা তাঁর কুঠরীর দরজা খুলে দিত। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চট্টগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তান রাত্রির পর রাত্রি জেগে আর একজন সহকর্ম্মীকে তার অসমাপ্ত কার্য্যভার বুঝিয়ে দিতেন। পরবিত্তলোভী শ্বেত-শোষকের বিরুদ্ধে তিনি যে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছিলেন, তাঁর জীবনের অবসানে সেই পতাকা কার হাতে দিয়ে যাবেন, সেই চিন্তাই তাঁকে সর্ব্বাধিক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, নিজের চিন্তা করার তাঁর অবসর ছিল না।

চট্টগ্রামের যে বীরকন্যা পাহাড়তলীর রেলওয়ে অফিসারদের ক্লাবে অভিযান চালিয়ে সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, সেই প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের কথা কিছু বলে আমার এই কাহিনী শেষ করব।

পাহাড়তলীর এই ক্লাব ছিল রেল ষ্টেশনের খুব কাছে, ইউরোপীয়রা এখানে প্রতি শনিবার রাত্রে এসে আমোদ-আহ্লাদ করতেন।

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরও ছিল এমনি এক শনিবারের রাত্রি। সেদিনও সেখানকার কক্ষে কক্ষে রোজকার মতই আনন্দরোল উঠেছিল। হঠাৎ রাত ন'টার সময় সমস্ত আনন্দোৎসব মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে গেল, তার বদলে শব্দ হতে লাগল বোমা ও রিভলভারের। প্রমোদবিলাসীরা আতঙ্কে উন্মাদের

মত এদিক-ওদিক ছুটোছুটী করতে লাগল। পনের মিনিট! পনের মিনিট পরে আবার ফিরে এল ক্লাবে মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা, কেবল মাঝে মাঝে আহতদের কাতরানির শব্দ।

মাত্র আটজন কিশোর ও যুবক প্রীতির নেতৃত্বে সেদিন পাহাড়তলীর ক্লাবে অভিযান চালিয়েছিল। সকলেই ফিরে এল অনাহত, কিন্তু প্রীতির বুকে এসে বিঁধল বোমার টুকরো। ক্লাব-ভবনের মাত্র দশ গজ দূরে প্রীতি সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করল।

কিশোরী বয়স থেকেই প্রীতির মন ছিল সংগঠনের দিকে। যখন সে স্কুলে পড়ত তখন সে গার্ল গাইডে যোগ দিয়েছিল।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে সে ঢাকায় পড়তে গেল। সেখানে সে দীপালি সঙ্ঘে যোগ দিয়ে লাঠি ও অসি খেলা শিক্ষা করে। এই সময়ে কলেজের ছুটিতে যখন সে দেশে ফিরত তখন চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সঙ্গেও সে মেলামেশা করত। এইভাবেই সে বিপ্লব-ধর্ম্মে দীক্ষা পায়।

ধলঘাটে পুলিস ও সৈন্যেরা যখন সূর্য্য সেনকে ধরার জন্য বাড়ী ঘেরাও করে, তখন প্রীতি একান্ত আকস্মিকভাবে সেখানে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করতে গেছল। সেবার সে মাষ্টারদার সঙ্গে পুলিসের বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হল। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও পুলিস তার ওপর কোন সন্দেহ পোষণ করত না।

এরপর প্রীতি কলিকাতায় আসে। এই সময়ে সে চাঁদপুরে ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জির হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ছদ্মবেশে গিয়ে চল্লিশবার সাক্ষাৎ করে। রামকৃষ্ণের ফাঁসির পরই সে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে ওঠে। ধলঘাটে নির্ম্মল সেনের মৃত্যুর পর তার এই ব্যগ্রতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

প্রীতির পিতা ছিলেন খুবই দরিদ্র, সংসার নির্ব্বাহ করতেন তিনি অতি কষ্টে। প্রীতি যেবার বি-এ পরীক্ষা দেবে, সেবার তাঁর সেই চাকুরীও চলে গেল। ফলে প্রীতিদের পরিবারে সাংঘাতিক রকমের অর্থকষ্ট দেখা দিল। এই সময়ে প্রীতি একটা হাই স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকুরী নিল। তা ছাড়া, ছাত্রী পড়িয়ে টাকা উপায় করেও সে সংসার চালাতে লাগল। এইভাবে, যখন সে নিরবলম্ব সংসারের একমাত্র রক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তখন পড়ল দেশের কাজে তার ডাক। প্রীতি সে ডাকে সাড়া দিল ; তার পিছনে রয়েছে বৃদ্ধ পিতা ও মাতা, চারিটি ছোট ছোট নিরন্ন ভাই ও ভগিনী। পাহাড়তলীর আহ্বান যখন তার কাণে পৌঁছুল, তখন যে সে তার অশক্ত পিতা-মাতা, অসহায় ভাই-ভগিনীদের কথা ভুলে গেছল তা নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল চল্লিশ কোটী মূক নিরন্ন নরনারীর কথা—যারা যুগের পর যুগ ধরে শাসনে-শোষণে-পীড়নে-লাঞ্ছনায় মানবিক সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলে পাথর হয়ে গেছে, মৃত্যুর অনস্তিত্ব যাদের কাছে জীবনের দুর্ব্বিষহ পথ-চলার চেয়ে বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে। একটা জাতির আত্মাকে যারা পীড়িত করেছে তাদের সে ক্ষমা

করতে পারেনি। তাই সে সাড়া দিয়েছিল পাহাড়তলীর ডাকে।

শুধু প্রীতি নয়। চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানের পর সারা বাঙ্গলায় যে বিপ্লব-বহ্নি জ্বলে ওঠে, বহু জীবনের আহুতিতে পবিত্র সেই যজ্ঞানল রক্তমুখী অগ্নিশিখায় আকাশের দিকে বাহু বাড়িয়েছিল। দীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী পরশাসনসঞ্জাত গ্লানি জাতির ললাটে যে কালিমা এঁকে দিয়েছিল, বাঙ্গলার মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ-তরুণীরা বক্ষরক্ত দিয়ে সেই কালিমা মুছেছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙ্গলায় বিপ্লবাত্মক সন্ত্রাসবাদের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সন্ত্রাসবাদ ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে পর্য্যায়ে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব হয়, ভারতেও সেই পর্য্যায় এসেছিল, বহু তরুণের বক্ষরক্তপিচ্ছিল পথে জাতিকে এগুতে হয়েছিল। ইতিহাসের প্রয়োজন মেটার পর গুপ্ত আন্দোলন বিদায় নিল, তারই সমাধির ওপর, তারই স্মৃতি ও ঐতিহ্যকে বুকে নিয়ে গড়ে উঠল গণ-আন্দোলনের অভ্রভেদী ইমারৎ। আজাদ হিন্দের সংগ্রাম, আগষ্ট বিপ্লব, নৌ-বিদ্রোহ প্রভৃতি চতুর্থ দশকের যে অভ্যুত্থানগুলো ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে এনেছিল, সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কয়েকটা সোপান মাত্র। ক্ষুদিরাম ও যতীন্দ্রনাথ, গোপীনাথ ও ভগৎ সিং, সূর্য্য সেন ও বিনয় বসুর নিঃশব্দ দুঃখবরণই নিদ্রালগ্ন জাতির কাণে ঘুম-ভাঙ্গানোর মন্ত্র শুনিয়েছিল। নিজেদের পঞ্জরাস্থির মশাল জ্বালিয়ে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমুক্তির অভিযানে জাতিকে তারা পথ

দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আজ মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে সমগ্র জাতি ভারতের সেই বীরসন্তানদের উদ্দেশে বেদনার অশ্রুসিক্ত প্রণাম জানাচ্ছে।